সুমন্ত আসলাম

কেউ একজন

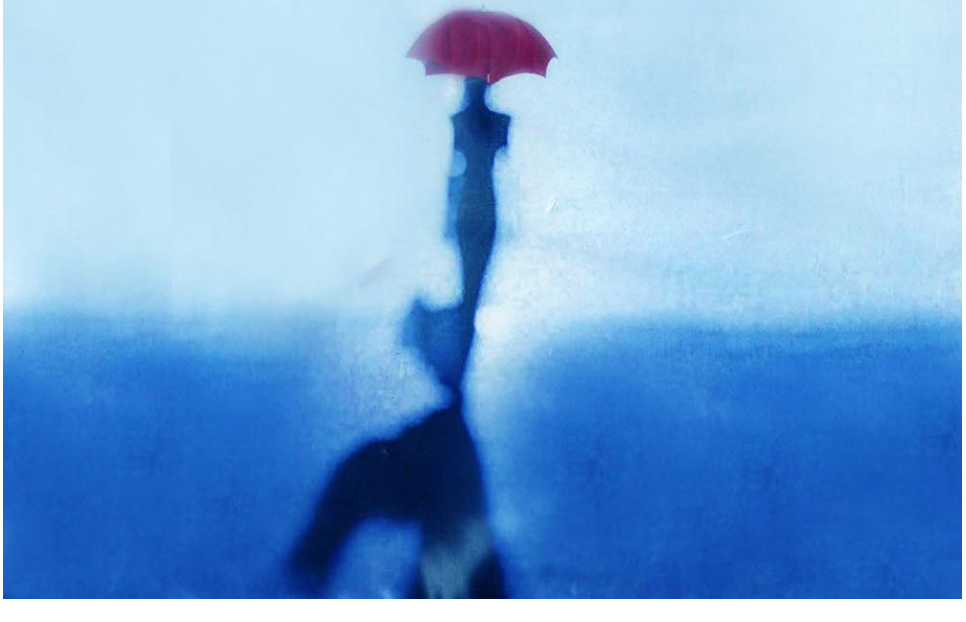

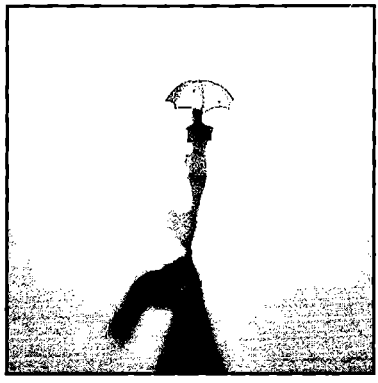

দুটো ফুটো আছে আমার ঘরের দেয়ালে, দু দেয়ালে। ডানপাশের দেয়ালের পাশে মা'র রুম, পেছনের দেয়ালের পাশে বাবার রুম। খুব ছোট্ট দুটো ফুটো। ফুটো দুটো দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় দু ঘরের ভেতরটা।

সপ্তাহের একটা দিন আমি ওই ফুটো দুটোতে চোখ রাখি। রাত ঠিক দেড়টার পর। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক সেই সময়টাতে। সপ্তাহের একটা দিন বাবা একটা করে মেয়ে নিয়ে আসেন বাসায়। আমাদের দারোয়ানটা গেট খুলে দেন। বাবা ঢুলতে ঢুলতে, মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে, টলমলানো পায়ে তার ঘরে ঢুকে, শব্দ করে বন্ধ করে দেন দরজাটা। তারপর ঠাস করে শুয়ে পড়েন বিছানায়, চিৎ হয়ে।

আরেক পাশে, জায়নামাজে বসে থাকেন মা। দু হাত তুলে তাকিয়ে থাকেন সামনে। যেন স্রষ্টা বসে আছেন সামনে, অসীম শূন্যে। মার ঠোঁট কাঁপতে থাকে, চোখ দুটোতে জলের ধারা, সমস্ত চেহারাটা কুঁচকে থাকে ছোট হয়ে।

মা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন। উঠে দাঁড়ান লাফ দিয়ে। পরনের সমস্ত কাপড় টেনে ছিঁড়তে থাকেন। গো গো শব্দ করে মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকান। চোখ দুটো বড় হয়ে যায় তার, যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে এখনই।

শরীরটা হিম হয়ে আসে আমার। দ্রুত ওখান থেকে সরে আসি ঘরের মাঝখানে। থমকে দাঁড়াই। চোখ বুজে, দু হাত দিয়ে চেপে ধরি দু কান। সমস্ত অনুভব দিয়ে চেষ্টা করি কোনো কিছু না দেখার, না শোনার। তবুও চোখের সামনে ভেসে ওঠে—বাবার বাহুলগ্নে নতুন নতুন নারী; জায়নামাজে বসে মার আকুলতা, ব্যকুলতা। বাবার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, মার করুণ-স্বরের কান্না।

চিৎকার করে উঠি আমি হঠাৎ-বন্ধ করুন আপনাদের অভিনয়, বন্ধ করুন আপনাদের ভণ্ডামি, নিছক কাঙ্গালিপনা, বন্ধ করুন। স্টপ!' চার দেয়ালে বাধা পেয়ে আমার চিৎকার ফিরে আসে আমার কাছেই। আমিই থেমে যাই, স্তব্ধ হয়ে যাই। নতজানু হয়ে, দু হাত কপালে ঠেকিয়ে, কেঁদে উঠি নিঃশব্দে।

তারপর, অনেকক্ষণ পর, বিরবির করে বলি—খুন করব আমি একটা! খুন!

অথচ রাজন্যা নামে এক রাজকন্যা বসে আছে আমার জন্য, তার সমস্ত আয়োজন নিয়ে, ভালোবাসার বর্ণিল ডালি নিয়ে!

তাঁকে দেখে খুব অবাক হই। সেই প্রত্যুষে অফিসে আসেন তিনি, বাসায় ফেরেন গভীর রাতে। পরের দিন আবার প্রত্যুষে...। এভাবেই তাঁর প্রতিদিন। মাঝে মাঝে ভাবি, একজন মানুষ কীভাবে পারেন এত পরিশ্রম করতে! এই বয়সে, সব পেয়ে যাওয়ার এই জীবনে!

প্রিয় সারওয়ার ভাই, প্রিয় গোলাম সারওয়ার

পরিশ্রম করার এই অসীম মূলমন্ত্রটা দেশের সবাইকে একটু জানানো দরকার। খুব উপকৃত হবে সবাই, হবে সফলও আপনার মতো। দীর্ঘজীবী হোন আপনি, অনেক দীর্ঘ—আমাদের জন্য।

যখন তুমি মানুষের সেবা করতে পারো না, তখন তুমি কীভাবে আত্মার সেবা করবে? যখন তুমি জীবনকেই জানলে না, তখন কী করে তুমি মৃত্যুকে বুঝবে?

—**কনফুসিয়াস** [খ্রি.পূ. ৫৫১-৪৭৯]
বিখ্যাত চীনা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ

সিদ্ধান্তটা চূড়ান্তভাবে নিই আমি তিন মাস আগে—কাজটা আমি করবই, করতে আমাকে হবেই। তারও দেড় মাস আগে, খুব সকালে, কেউ জাগেনি তখনো, কেবল কোরাস গাইতে শুরু করেছে দু-একটা কাক, ঠিক তখন, প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যায় আমার। ঘুমিয়ে ছিলাম। চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি, মা দাঁড়িয়ে। বিছানার কাছ ঘেঁষে এসে, আমাকে আরো একটা ধাক্কা দিয়ে, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা বাচ্চা মেয়ের মতো উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'রাফিদ, দেখ তো, কেমন লাগছে আমাকে!'

মা'র দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। যতটুকু ঘুম ছিল, সামনে দাঁড়ানো তাকে দেখে তার সবটুকুই উধাও হয়ে গেল চোখ থেকে। সেই জায়গায় এসে ঠাঁই নিল বিস্ময়! কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা! শাড়ি ছাড়া মাকে কখনো দেখিনি, এমনকি অন্য পোশাকেও। সালোয়ার আর কামিজ পরে আছেন মা এখন। মাথার চুলগুলো টেনে পনিটেইল করেছেন, লাল একটা টিপ পরেছেন কপালে, ঠোঁট দুটোও লিপস্টিকের আঁচড়ে চকচক করছে, কেবল ফাঙ্গাসের মতো সাদা দেখাচ্ছে সারা মুখটা। ছোপ ছোপ সাদা হয়ে আছে পাউডারে।

হাত ধরলাম আমি। ঝট করে মা সেটা সরিয়ে নিয়ে কিছুটা রাগী গলায় বললেন, 'বললি না, কেমন লাগছে আমাকে!'

মাকে আমি চিনি, খুব ভালো করে চিনি। ঘুমোনোর আগ পর্যন্ত যিনি আমাকে তার ছায়ায় আবৃত্ত রাখেন, পিপাসা লাগার আগেই পানি নিয়ে এসে হাজির হন চকচকে গ্লাসে, কোনো কিছুর প্রয়োজনের মুহূর্তেই সেটা এনে হাজির হন অলৌকিকভাবে, যিনি আমার মুখটা দিনে কয়েকবার বুলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকেন মুগ্ধতায়, প্রায়ই মাথা ঠেকিয়ে শব্দহীন কান্নায় ভাসিয়ে দেন আমার বুক—তাকে চিনব না! প্রচণ্ড আবেগী আমার এই মা, একটা প্রশ্ন করেছেন, উত্তর দিতে হবে সেটার। না হলে আবেগটা রাগে রূপান্তরিত হবে, একটু বেশিই হবে।

চোখে মুগ্ধতা ফুটিয়ে তুললাম আমি। খাট থেকে নেমে মা'র একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'খুব সুন্দর লাগছে মা, আপনাকে। পরীর মতো লাগছে।' মা'র গায়ের নীল ওড়নার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'নীল পরী।'

দু'হাত একসঙ্গে করে হাততালি দেওয়ার মতো করলেন তিনি, লাফিয়েও উঠলেন একটু। চোখ দুটো প্রসারিত করে বাচ্চাময় হাসিতে বললেন, 'পরীর মতো লাগবে না! সেই কখন থেকে সাজছি। একবার সাজি, ভালো লাগে না, ধুয়ে ফেলি। আবার সাজি, ভালো লাগে না, আবার ধুয়ে ফেলি। শেষে নয়বার সাজার পর ভালো লেগে যায় আমার।'

'কখন থেকে সাজা শুরু করেছেন আপনি?' গলা শুকিয়ে আসে আমার।

'তোর বাবা যখন ঢুলতে ঢুলতে বাইরে থেকে এসে ঘুমিয়ে পড়ল, তুই যখন পড়া শেষ করে লাইট অফ করে দিলি, তার একটু পর থেকে।' মা খুব তৃপ্তির সুরে বলেন।

'বাবা, বাসায় ফিরেছেন!'

'হ্যাঁ, তিন দিন পর ফিরল।'

'একাই ফিরেছেন?'

'একাই তো দেখলাম। কোনো মাতারিকে তো আজ—।' মা'র একটা হাত ধরে দ্রুত জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, 'রাত শেষে সকাল কেন হয়, জানেন?' মাকে বাক্যটা শেষ করতে দিই না আমি, পাল্টে ফেলি প্রসঙ্গ।

মা জবাব দেন না, আগ্রহী চোখে তাকিয়ে থাকেন।

'অন্ধকারই শেষ না, আলো আসে একসময়।'

গভীর চোখে মা আমার দিকে তাকালেন। হঠাৎ ফিক করে হেসে উঠে বললেন, 'তোর কোনো বান্ধবী নেই, রাফিদ?'

'আপনি তো জানেন, মা।'

কিছু একটা মনে করার মতো চেহারা করলেন মা। কয়েক সেকেন্ড। উৎফুল্ল হয়ে আমার কাঁধে আলতো একটা হাত রেখে বললেন, 'ও, আছে তো!' তারপরই মুখটা ম্লান করে বললেন, 'কিন্তু আমি তো ওকে দেখিনি।' আচ্ছা—।' ওড়নাটা যত্ন করে ঠিক করেন মা, 'ওর নামটা যেন কি?'

'নামটাও আপনাকে বলেছি।'

মা আবার কিছু মনে করার মতো চেহারা করেন। কিন্তু চেহারা আবার

ম্লান করে, মাথা এদিক-ওদিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, ঠোঁট উল্টিয়ে বলেন, 'মনে করতে পারছি না।'

'আরো একবার চেষ্টা করুন।' মা'র সঙ্গে কথা বলতে হবে আমার এখন, অবিরত। মাথা থেকে সব রকম এলেমেলো ভাবনা দূর করতে হবে তার।

মা একটু ভাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দু-তিন সেকেন্ড ভেবেই হতাশার স্বরে বলেন, 'না, মনে আসছে না।'

'রাজন্যা ঐশ্বর্যময়ী।'

চোখ ঝকঝক করে ফেলেন মা, 'ও ও ও। কিন্তু—।' মা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নামটা একটু কঠিন না!'

'একটু।'

'একটু না, অনেক বেশি।'

তাল মেলাই আমি মা'র সঙ্গে, 'হ্যাঁ, অনেক বেশি।'

'আচ্ছা—।' মা আবার বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে উঠে বলেন, 'ও দেখতে কেমন? আমার চেয়ে সুন্দর?'

'তা তো জানি না।' লজ্জা লাগে আম্মার।.

'বাসায় নিয়ে আসবি একদিন? ভালো করে দেখব ওকে। তারপর আমিই বলে দিব, কে বেশি সুন্দর। যদি ও বেশি সুন্দর হয়, তাহলে আমার সব গয়না আমি ওকে দিয়ে দেব।'

'আর আপনি যদি বেশি সুন্দর হন?' কৌতূহলী চোখে মা'র দিকে তাকাই।

ঝট করে জবাব দেন না মা। তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। ভাবনাময় চেহারা। ভাবতে ভাবতে মা বলেন, 'তাহলে—।' থেমে যান মা। শেষ করেন না কথা। জানালা থেকে সরে এসে পা তুলে বসেন খাটে।

খাটে মা'র পাশে এসে বসি আমিও। আলতো করে মাথায় হাত রাখি তার। কিন্তু মা হঠাৎ লাফ দেওয়ার মতো খাট থেকে নেমে মেঝের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান। নাচের মতো অঙ্গভঙ্গি করে বলেন, 'রাফিদ, নাচ দেখবি একটা? ওই যে টিভিতে নাচ দেখায় না, ওরকম। আমি এখন নাচব।'

'নাচবেন!'

'হ্যাঁ, নাচব।' নাচার প্রস্তুতি নিতে থাকেন মা।

দ্রুত মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াই আমি। হাত চেপে ধরে বলি, 'মা, সারা রাত ঘুমাননি আপনি। চলুন, আপনার ঘরে যাই। মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। ঘুম এসে যাবে আপনার।'

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিয়ে মা বলেন, 'না, ঘুমাব না আমি।' হাত আঁকাবাঁকা করেন মা, 'নাচব। গানও গাইব একটা।' খুক করে একটু কেশে মা গাইতে থাকেন, 'নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে—।' মা থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তার পরের লাইনটা যেন কী, রাফিদ?'

'আমি জানি না, মা।'

'জানিস না!'

'না।'

কিছুটা রাগী চোখে মা আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিক করে হেসে ফেলেন, 'আমি বরং একটা কবিতা বলি। ওইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের-।' মা আবার থেমে গিয়ে বলেন, 'ডালিম গাছের নিচে কবর দেওয়া হয়েছিল কেন? কবরস্থান ছিল না তখন!'

'মা, আপনার চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ঘুম পাচ্ছে আপনার। চলুন, আপনি ঘুমাবেন।'

'বললাম তো আমি ঘুমাব না। আমি নাচব, গান গাইব—ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত...।'

'মা—।' মা'র দু'কাঁধ ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, 'থামুন তো। আপনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন!'

চোখ স্থির করে মা আমার দিকে তাকান। কিছু বলেন না তিনি। ভিজে উঠছে চোখের সাদা অংশ, কালো অংশ, কোনার দিকটা। ভারী হয়ে সেগুলো গড়িয়ে পড়ছে নিচে, চিবুক বেয়ে। থমকে দাঁড়ায় ঠোঁটের কোনায়।

জড়িয়ে ধরি আমি মাকে। আলতো করে তিনি ঢলে পড়েন আমার কাঁধে। চেতনাহীন। পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়াই তাকে। শরীরে একটা কাঁথা টেনে দিয়ে টাওয়ালটা ভিজিয়ে আনি বাথরুম থেকে। মুখ, চোখ, কপাল, হাত, পায়ের তালু সব মুছিয়ে দিয়ে হাত বুলাতে থাকি মাথায়। এরই মধ্যে একটু জেগে উঠে, একপলক তাকিয়ে, আমাকে দেখে, ঘুমিয়ে পড়েন আবার।

তিন মাস আগে, মাঝরাতের দিকে, শরীরে স্রেফ সাদা একটা বিছানার চাদর পেঁচিয়ে, মা হঠাৎ আমার ঘরে ঢোকেন। পরীক্ষা সামনে। পড়ছিলাম। এই

পরীক্ষার রেজাল্টের ওপর নির্ভর করছে আমার অনেক কিছু—আমার অস্তিত্ব, আমার স-ব। শব্দ পেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, দু'পা তুলে খাটের ওপর বসেছেন মা। ডানে-বামে দুলে, খুব আনন্দ নিয়ে, চোখ দুটো চকচক করে, গুনগুন করে ছড়া বলছেন একটা।

টেবিলের ওপর বইটা উপুড় করে রেখে মা'র পাশে এসে বসি। পায়ের নিচের অংশটা অনেকখানি বের হয়ে আছে মা'র। চাদরটা টেনে দিই আমি। মা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'এত টানাটানি করছিস কেন!'

'টানাটানি করছি না মা। ঠিক করে দিলাম।'

'অত ঠিক করতে হবে না, যা।'

'মা—।' মা'র পিঠে হাত রাখি, 'এই চাদর পরেছেন কেন আপনি?'

'আমি এখন থেকে এটা পরেই থাকব। মহাত্মা গান্ধী হবো আমি, মহিলা মহাত্মা গান্ধী।'

'মানুষ বলবে কি!'

'সেটার আমি কি জানি!' মা গলার স্বরটা খুব মোলায়েম করে বলেন, 'একটা জিনিস কিনে দিবি আমাকে?'

'কিনে দেব।' মা'র হাত চেপে ধরে আন্তরিকভাবে আমি বলি, 'আপনি যা চাইবেন তাই কিনে দেব।'

'একটা ছাগল কিনে দিবি, দুধ দেয় যে ছাগল, সেই রকম ছাগল। আমি এখন থেকে কোনো কিছু আর খাব না। গান্ধীর মতো শুধু দুধ খাব, ছাগলের দুধ। আচ্ছা—।' মা আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলেন, 'আচ্ছা, উনি কি দুধে চিনি খেতেন, না গুড় খেতেন? না এমনি এমনি খেতেন?'

'আমার মনে হয় এমনি এমনি খেতেন।'

'কী করে বুঝলি?'

মা'র হাত ধরি আমি আবার, 'মা, এখন তো অনেক রাত, ঘুমাবেন না?'

'আমার কথার জবাব দে আগে।'

'ওটা তো আমি জানি না।'

'তাহলে কিসের এত ঘোড়ার ডিমের লেখাপড়া করিস! বইয়ের কোথাও লেখা নেই, দুধে উনি কি খেতেন? ভালো কথা—।' মা হঠাৎ বিছানা থেকে দ্রুত নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ান। চাদরটা ভালো করে পেঁচিয়ে কিছুটা ধমকের স্বরে বলেন, 'কোথাও তাকাবি না তুই, সরাসরি আমার দিকে

তাকিয়ে থাকবি। আমি এখন নাচব, তুই দেখবি। তারপর আমাকে নাম্বার দিবি। টেলিভিশনে যে রকম নাচের অনুষ্ঠান হয় না, যে রকম নাচে না, সে রকম নাচব। আমার নাচ দেখে নাম্বার দিবি তুই।' চাদরটা আরো ভালো করে পেঁচিয়ে মা বলেন, 'ভালো করে নাম্বার দিবি কিন্তু!'

জড়িয়ে ধরি আমি মাকে, নাচতে দেই না। নাচা শুরু করলেই চাদরটা খসে পড়বে শরীর থেকে। বিব্রতকর একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে। মা প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বলেন, 'এভাবে জড়িয়ে ধরেছিস কেন আমাকে? বললাম না, আমি নাচব।'

জানালার দিকে তাকাই আমি। চাঁদ উঠেছে, সম্ভবত পূর্ণ চাঁদ। মাকে একটু জোর করে, কিছুটা কৌশল করে, জানালার কাছে নিয়ে আসি। চাঁদের আলোয় মিতুদের থাইয়ের জানালাটায় সম্পূর্ণ চাঁদটা ডুবে আছে, চকচক করছে শাওনদের পানির ট্যাংকির ওপর রাখা আচারের কাচের বোয়ামটা, নতুন রং করা মোর্শেদদের সামনের গেটের গ্রিলটা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে অবিরত।

মাকে আরো একটু জড়িয়ে ধরি আমি। তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলি, 'আমার জন্মের সময় আপনি মরতে বসেছিলেন, কথাটা আপনি প্রায়ই বলেন, শুনতে ভালো লাগে আমার। আরেকবার বলবেন?'

'না।' মা অভিমানী গলায় বলেন।

'বিয়ের আগে একটা ছেলে যে আপনাকে খুব জ্বালাত, সেই গল্পটা আরেকবার বলেন না?'

'না।'

'তাহলে ওই স্বপ্নটার কথা বলেন না, ওই যে, যেটা দেখে আপনি এখনো চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠেন।'

'না।'

'সবাই তাদের মাকে তুমি করে বলে, আমি কেন আপনাকে আপনি বলি—এটা আপনি জানতে চেয়েছেন অনেক দিন। বলা হয়নি। আজ বলি?'

মা কিছু বলেন না এবার। যেভাবেই হোক, যে কথাই বলে হোক, মা'র চিন্তাটা অন্যদিকে নিয়ে যেতে হবে। হাত চেপে ধরে মাকে আবার খাটে এনে বসাই। বাচ্চাদেরকে গল্প বলার মতো মা'র ঠিক সামনে বসে বলি, 'ছোটকালে একটা স্যার এসে পড়াতেন আমাকে। পছন্দ হচ্ছিল না স্যারটাকে। তুই তুই করে কথা বলছিলাম তার সঙ্গে। আপনি খুব রেগে

গিয়ে আমার ডান গালে একটা থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, বড়দের সঙ্গে আপনি করে কথা বলতে হয়। আপনার আগে কেউ কোনোদিন আমার গায়ে হাত তোলেনি। খুব কষ্ট হয়েছিল আমার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, বয়সে বড় অনেককে হয়তো আমি আপনি করে বলব না, কিন্তু আপনাকে আমি আপনি করে বলব।'

গভীর চোখে মা আমার দিকে তাকান। বেদনাময় হয়ে উঠছে তার চোখ দুটো। তিরতির করে কাঁপছে ঠোঁট জোড়া। নাকটা লাল হয়ে উঠেছে, দু'পাশটা ফুলে ফুলে উঠছে। মা একটা হাত এগিয়ে দেন আমার ডান গালে। চেপে ধরে বসে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর উঠে চলে যান তার নিজের ঘরে। চাদরটা পড়ে থাকে আমার বিছানাতেই। চোখ দুটো বুজে অনেকক্ষণ বসে থাকি। হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় আমার মাঝে। বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে, ফাঁকা হয়ে যায় মাথার ভেতরটা, শূন্য শূন্য লাগে সবকিছু। সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি আমি তখনই—কাজটা আমি করবই, করতেই হবে।

জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছি, অনেকক্ষণ। আজ আর ঘুম আসবে না, পড়াও হবে না। দূরে কোথাও আজান হচ্ছে ফজরের। একটু পর আরো একটা মসজিদে, তারপর আরো কয়েকটাতে।

আলো ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু। ফেলে রাখা চাদরটা নিয়ে মা'র ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দরজা বন্ধ। নক করতে নিয়েই থেমে যাই। ফিরে আসি নিজের ঘরে। মোবাইলটা বেজে ওঠে তখনই। চমকে উঠি। এত সকালে ফোন! হাতে নিই টেবিলের ওপর রাখা মোবাইলটা। স্ক্রিনে নামটা দেখে ভয়টা আরো বেড়ে যায়। রিসিভ করে কিছু বলার আগেই রাজন্যা বলে, 'সরি। সম্ভবত ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

জেগেই ছিলাম এতক্ষণ—এই সত্যটা বলতে গিয়েই থেমে গেলাম। কারণ এটা বলার পর প্রশ্ন আসত আরো অনেকটা। আমি বরং গলায় অবাক সুর তুলে বলি, 'রাজকন্যা, তুমি এত সকালে!'

'রাজকন্যা!' গলাটা মধুময় করে রাজন্যা বলে, 'খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল এই ডাকটা।'

'তাই বলে এত সকালে!' গলাটা খাদে নামিয়ে বলি, 'সম্ভবত ঘুম হারিয়ে গেছে তোমার, না?'

'মোটেও না।' রাজন্যা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমি অন্য রকম অনুভূতিতে

নিজের সময় কাটাচ্ছি, রাফিদ। আই ক্যান্ট এক্সপ্লেইন দ্যাট। আমার কি মনে হয় জানো?' রাজন্যা ওর প্রশ্নের উত্তরে আরেকটা প্রশ্ন আশা করে। কিন্তু চুপ থাকি আমি। একটুও নিরাশ না হয়ে আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমার সব কথা না ও বুঝতে পারে, রাফ।'

মুখটা হাসিময় হয়ে যায় আমার, ম্লান হাসি, 'বোঝা তো দূরের কথা, শোনা তো দূরের কথা, ও তো এখনো কেবল বিন্দুতেই আছে, রাজকন্যা।'

'তবুও। একা থাকলেই সারাক্ষণ আমি আমার পেটের দিকে তাকিয়ে থাকি, কথা বলি। রাফ, কী যে আনন্দ, কী যে বর্ণিল!'

'তোমার একটুও ভয় করছে না?'

'সোয়্যার, একটুও না। বরং আই অ্যাম এক্সসাইটেড। মা যেদিন বাবাকে ছেড়ে চলে গেল, সেদিন থেকেই কেমন চুপ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমাদের এত বড় বাড়িতে অধিকাংশ সময় বাবা পরবাসী, আর আমি একা। কী অসহনীয় একা! এখন আর নিজেকে একা মনে হয় না, রাফ। সারাক্ষণ মনে হয় কেউ একজন আছে, কেউ একজন আমার পাশে আছে, কাছে আছে।' রাজন্যা একটু থেমে বলে, 'আমার ভেতরে আছে!'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ি আমি। রাজন্যা শুনে বলে, 'তুমি খুব চুপচাপ হয়ে গেছ, রাফ। তোমাকে তো আগেই বলেছি, সবকিছুর দায় আমার। তুমি না চাইলে, কেউ জানবেও না আমার গর্ভের ভ্রূণে কার অংশীদারিত্ব বহন করছি। প্রমিজ টু ইউ, কেউ জানবে না।'

শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ি আমি, আরো একটা। রাজন্যা খুব মিষ্টি করে হেসে বলে, 'এত ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছ তুমি!'

'একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, রাজকন্যা।'

খুব স্বাভাবিক স্বরে রাজন্যা বলল, 'কী সিদ্ধান্ত, রাফ?'

'আপাতত একটা মানুষ খুন করব আমি। স্রেফ একটা মানুষ।'

দুটো ফুটো আছে আমার ঘরের দেয়ালে, দুই দেয়ালে। ডান পাশের দেয়ালের পাশে মা'র রুম, পেছনের দেয়ালের পাশে বাবার রুম। খুব ছোট্ট দুটো ফুটো। ফুটো দুটো দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় দু'ঘরের ভেতরটা।

সপ্তাহের একটা দিন আমি ওই ফুটো দুটোতে চোখ রাখি। রাত ঠিক দেড়টার পর। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক সেই সময়টাতে। সপ্তাহের একটা দিন বাবা একটা করে মেয়ে নিয়ে আসেন বাসায়। আমাদের দারোয়ানটা গেট খুলে দেন। বাবা ঢুলতে ঢুলতে, মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে, টলমলানো পায়ে তার ঘরে ঢুকে, শব্দ করে বন্ধ করে দেন দরজাটা। তারপর ঠাস করে শুয়ে পড়েন বিছানায়, চিৎ হয়ে।

কিছুক্ষণ নীরবতা, কিছুক্ষণ চঞ্চলতা, পারিপার্শ্বিকতা, তারপর চারপাশটা একপলক ভীরু চোখে তাকিয়ে, বাবার পায়ের কাছে বিছানায় বসে, স্থির হন মেয়েটি। এই সময়টাতে চেহারাটা ভালো করে দেখতে পাই আমি তার। বড় আপুর বয়সী, সাতাশ-আটাশ এবং সন্দেহাতীতভাবে সুন্দরী।

বাবার পায়ের জুতো জোড়া খুলতে খুলতে মেয়েটা একপলক বাবার দিকে তাকান। মুচকি হাসি তার মুখে, কিছুটা অবজ্ঞারও। জুতো জোড়া খুলে খুব যত্ন করে, গুছিয়ে পাশে রেখে, তারপর মোজা দুটো খুলতে থাকেন। আঙুলের লম্বা নখগুলো দিয়ে অচ্ছুৎ জিনিস ধরার মতো মোজা জোড়া খুলে ছুড়ে ফেলে দেন অবহেলায়, জুতোর পাশেই। বাবা তখনো চোখ বুজে।

মেয়েটা এরপর একটু ঝুঁকে বসে প্যান্টের বেল্ট খুলতে থাকেন বাবার। বাবা আলতো করে তার পিঠে হাত রাখেন তখন। একটু পর ঠেসে ধরেন নিজের বুকের সঙ্গে। খিলখিল করে হেসে ওঠেন মেয়েটি। উঠে বসেন বাবা এবার। মুগ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বাবা কী একটা গানও গেয়ে ওঠেন। গানের কলিটা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু বাবার ঠোঁট, বাবার চোখ,

বাবার লালচে হয়ে ওঠা গাল দুটো বলে দেয়, গানটা খুবই রোমান্টিক। ষাটের কাছাকাছি বয়সের এক পুরুষের হাতের বন্ধনে প্রায় অর্ধেক বয়সী একটা মেয়ে, কেমন যেন বেমানান মনে হয় আমার। কোনো কিছুতেই কোনো কিছু মেলাতে পারি না আমি।

বাবা অবশ্য এর চেয়ে কম বয়সী মেয়ে নিয়ে আসতেন বাসায়, আগে। বাইরের কোনো মেয়ে ছিল না তারা, বাবার অফিসেরই। দুটো সফল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কয়েকটা অফিস, অনেক অফিস কর্মী। তারই কয়েকটাকে পালা করে বাসায় আনা, খুব কঠিন কিছু না বাবার জন্য। কয়েকজনকে বাবা নিয়মিত বাসায় নিয়ে আসতেন। কিন্তু একদিন কী একটা ভুল হয়ে যায়। ব্যাপারটা মিডিয়াতেও এসে যায়, থানাতেও গড়ায়। টাকার ছায়া হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছায়া, বাবা তার সবকিছু ছায়াতে ঢেকে ফেলেন ওই টাকার জোরেই, টাকার কারিশমাতেই।

রুচি বদলান বাবা তারপর। অফিস কর্মীর পরিবর্তে নতুন নতুন মেয়ে, বাইরের মেয়ে। বাসায় নিয়ে আসেন তাদের। সপ্তাহে একদিন। আজ বৃহস্পতিবার, আজও নিয়ে আসবেন। নতুন একটা মেয়ে।

বারোটা বেজে গেছে সতের মিনিট আগে, একটু পরই বড় আপুর ফোন আসবে। সপ্তাহের এই একটা দিন আপু আমাকে ফোন করে, সুদূর কানাডা থেকে। আমাদের কথোপকথন চলে কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট।

বড় আপুকে বাবা আদর করে ডাকতেন মম; মা ডাকতেন মুমুম; আমি ডাকি ট্রিপল এম। একটা মানুষের সবকিছুই সুন্দর হবে, এটা আপুকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না আমি। আপু কথা বলে দুটো জিনিস দিয়ে—মুখ দিয়ে তো বটেই, চোখ দিয়েও। একটা মানুষের জীবন যে কত গোছানো হতে পারে, কত স্টাইলের হতে পারে, কত নন্দনময় হতে পারে, এটাও আপুকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আপুর জীবনটা ছিল কাচে ঘেরা পুতুলের মতো-নির্ভার, নিঃশব্দ, নিরাপদ। ভার্সিটিতে পড়তে পড়তে চার বছর আগে সেই আপু বিয়ে করে বসল বাবার এক বন্ধুকে; আপু তেইশ, বাবার বন্ধুর বায়ান্ন। বাবা প্রথমে মেনে না নিলেও পরে মেনে নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মা ছিলেন অনড়, রুদ্র। আপু ওর স্বামীকে নিয়ে বাসায় এসেছিল একদিন, মা কথা বলেননি, দেখাও করেননি। দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে ছিলেন সারাক্ষণ। সেটাই শেষ আসা ছিল আপুর, বাসায়।

তারপর অনেক দিন কোনো যোগাযোগ নেই। হঠাৎ একদিন ফোন, কানাডা থেকে। সেই যে শুরু, এখনো। কথা হয় কেবল আমার সঙ্গে। বাবা, মা কারো সঙ্গেই না, বড় ভাইয়ার সঙ্গেও না।

চুপচাপ বসে আছি আমি। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে অনেক আগেই। আমাদের তিনতলায় নতুন একটা ভাড়াটে এসেছে। কলেজ পড়ুয়া একটা মেয়ে আছে তাদের। ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। সম্ভবত দু-তিন বছরের ছোট হবে আমার চেয়ে। অনেক রাত করে পড়াশোনা করে, খুব সিরিয়াসলি করে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, বেশ শব্দ করে পড়ে সে। প্রথম প্রথম প্রচণ্ড খারাপ লাগত, এখন লাগে না। নির্জন রাতে, কোনো কোনোদিন যখন একদম ঘুম আসে না আমার, তখন চুপচাপ মেয়েটির পড়া শুনি আমি। কিছুটা সুর তুলে, কিছুটা থেমে থেমে তার পড়ে যাওয়া, বেশ ভালো লাগে। সেদিন সিঁড়িতে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। আমি উঠছিলাম, ও নামছিল। আমাকে দেখে এমনভাবে সিঁড়ির সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়াল, মজাই লেগেছিল। বাড়িওয়ালাদের দেখে অনেক ভাড়াটেরাই এভাবে, কাতর হয়ে দাঁড়ায়। কেন? তারা তো ফ্রি থাকেন না, মাস শেষে নগদ টাকা পে করে তবেই থাকেন। তাহলে? ভালো লাগে না ব্যাপারটা।

আজও পড়ছে মেয়েটা, শব্দ করেই। কয়দিন পর আমার পরীক্ষা, পড়া দরকার আমারও। কিন্তু পড়তে পারছি না। রাজন্যাকে বলেছিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করতে, লেখাপড়া করছি কিনা সেটা জানতে—ইন্সপাইয়ার করতে। সারাদিন দশবারের ওপরে ফোন করেছে। ঘণ্টা দুয়েক আগে মানা করেছি। অসুস্থ তো!

বারোটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট। সম্ভবত আপু আজ ফোন করবে না। কোনো সমস্যা হতে পারে। একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুমানো যাবে না। বাবাকে দেখব, বাবার নতুন সঙ্গীকে দেখব। তারপর মা'র ঘরের দেয়ালে চোখ রাখব আমি। আমার ভেতরের আসল আমিকে তখন অনুভব করব তীব্র ঘৃণায়, প্রবল আক্রোশে। দুমড়ে-মুচড়ে ফেলতে ইচ্ছে করবে তখন আমার পৃথিবীর সবকিছু, সব সৃষ্টি।

না, সময়টা কাটতে চাচ্ছে না। গেটের শব্দও শুনতে পাচ্ছি না, বাবাও আসছেন না।

ফোনটা বেজে ওঠে হঠাৎ। পাশেই ছিল। স্ক্রিনে কোনো নাম নেই। রিসিভ করে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল, মিষ্টি

হাসি। প্রাচী ফোন করেছেন। মেয়েটি আমার কেউ না, কখনো দেখিওনি আমি। হঠাৎ একদিন ফোন করে আমাকে বলেন, 'মাত্র তিন মিনিট সময় নষ্ট করব আপনার। অ্যালাউ মি, প্লিজ।' ভূমিকাহীন এ রকম বাক্য শুনে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তার চেয়েও বেশি মুগ্ধ হয়েছিলাম তার কণ্ঠ শুনে—শান্ত, ঠাণ্ডা, মাদকতাময়! সেদিন দু'মিনিটের আগেই শেষ করেছিলেন কথা।

প্রাচী কেন আমাকে ফোন করে, এ প্রশ্নটা কখনো করিনি তাকে, সেও বলেনি। অনুরক্ত হয়ে ফোন করলে যে ধরনের বাক্য বিনিময় হয়, সেই ধরনের বাক্যও কোনোদিন বিনিময় হয়নি ওর সঙ্গে। কথা শুরু করে হঠাৎ করে, শেষও করে হঠাৎ করেই।

হাসির শব্দ শুনে কিছুটা বিরক্ত লাগল আজ। প্রকাশ করিনি আমি, কিন্তু টের পেল প্রাচী। হাসতে হাসতেই বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে আপনার শরীরের অনেক নার্ভ কাজ করছে না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে না, কেন?'

খুব শান্তভাবে আমি বললাম, 'কেন?'

'বিরক্ত হলে মন খারাপ হয়ে যায় মানুষের। আর মন খারাপ হলেই শরীরের অনেক নার্ভ সিস্টেম ব্লক হয়ে যায়। ওকে, আজ মাত্র দেড় মিনিট সময় নেব আপনার।' প্রাচী একটু থেমে বলেন, 'কোনো নদীর কাছাকাছি গিয়েছেন কখনো?'

'না।'

'নদীর স্থির জলে কখনো তাই আপনার মুখটাও দেখা হয়নি। নদীর জলে মানুষের গভীর ছায়া তিরতির করে কাঁপে। মনে হয়, ওই তো, ওই তো আমার প্রিয় প্রতিকৃতি, আমার অবয়ব, একটু ছুঁয়ে দেখি, একটু। কিন্তু ছুঁতে গেলেই সেটা আর ওটা থাকে না, জল হয়ে যায়।' প্রাচী ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'অনেক কিছুই তাই ছুঁতে মানা। মানুষের মন ছোঁয়া মানা, সুখ ছোঁয়া মানা, নিগূঢ় কিছু সত্য ছোঁয়া মানা—।' খিলখিল করে হেসে ওঠেন প্রাচী, 'খুব কঠিন কথা হয়ে যাচ্ছে, না? ঠিক আছে, অন্য প্রসঙ্গে আসি। বটগাছ তো দেখেছেন!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কোনো বটগাছের নিচে বসেছেন কখনো? তার ভেজা ছায়ায় ভিজিয়েছেন নিজেকে? যে ছায়ায় চোখ দুটো বুজে আসে আপনাআপনি, আবেশ?'

'না।'

'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাদের কাছে পূর্ণিমা-অমাবস্যা চিরদিন সমান রহিয়া গেল, অত্যন্ত সুস্থ শরীরটাকে সুদীর্ঘকাল বহন করিয়া তাহাদের লাভ কি?' প্রাচী খিলখিল করে আবার একটু হেসে বলেন, 'বলুন তো, কার কথা এটা?'

'জানি না।'

'প্রমথ চৌধুরীর। লেখক ছিলেন।' প্রাচী একটু থেমে বলেন, 'আচ্ছা, দেড় মিনিট কি হয়ে গেছে?

'অনেক আগেই, অন্তত দুই মিনিট আগে।'

'তার মানে আমি সাড়ে তিন মিনিট কথা বলেছি!'

'সমস্যা নেই। আপনি আরো সাড়ে তিন মিনিট কথা বলতে পারেন।'

'সম্ভবত মনটা খুব ভালো আছে আজ আপনার।'

'না, অন্য দিনের মতোই—বিশেষত্বহীন।'

'মোটেই বিশেষত্বহীন না। প্রতিটি দিনেরই একটা বিশেষত্ব আছে।'

'আছে নাকি!' কৌতুকের স্বরে বলি আমি।

'আছে। কিন্তু কেউ বুঝতে পারে, কেউ পারে না। আপনার আজকের দিনের বিশেষত্ব কি জানেন?'

'না।'

'আপনাকে আজ কোনো কিছুর জন্য চোখ দুটোকে ভেজাতে হয়নি, কোনো কিছু পাওয়ার জন্য দুঃখ এসে ঠাঁয় নেয়নি আপনার বুকে, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসেনি কোনো চাপা কষ্টে।'

'আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'সরি, আপনার জানাটা ভুল।'

'মোটেই না। আমার জীবনের অনেক কিছুই হয়তো ভুল, কিন্তু এ জানাটা ভুল না।' ফোনটা রেখে দেন প্রাচী।

চুপচাপ বসে থাকি আমি অনেকক্ষণ। প্রচণ্ড হাসতে ইচ্ছে করে আমার,

সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে হাসতে ইচ্ছে করে।

ফোনটা আবার বেজে ওঠে। প্রাচী আবার খিলখিল করে হেসে উঠে বলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।' একটু থামে প্রাচী, 'আপনি কি জানেন, আমি কে?'

'না।'

'সম্ভবত আমি নিজেও জানি না আমি কে।' খিলখিল হেসে ফোনটা আবার কেটে দেয় প্রাচী।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হলো বাসার সামনের গেটে। আমি নিশ্চিত, বাবা এসেছেন। সমস্ত জটিলতা ফেলে আমি প্রস্তুত হলাম—বাবাকে দেখব, বাবার নতুন বিলাস-সঙ্গীকে দেখব। পেছনের দেয়ালের ফুটোর সামনে থেকে চে গুয়েভারার ছোট্ট মাথাটাকে সরিয়ে ফেললাম। দেয়ালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা ওই মাটির মাথাটা আমার প্রগাঢ় অনুভব, আমার প্রেরণা, শক্তি, উদ্যমতা।

শব্দ করে দরজা খুললেন বাবা, বন্ধও করলেন। তারপর যথারীতি শুয়ে পড়লেন বিছানায়, ঠাস করে, চিৎ হয়ে।

আজকের মেয়েটা একটু অন্য রকম। কেমন যেন বিষণ্ন, চুপচাপ। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে, মাথা নিচু করে, আঙুলের সঙ্গে ওড়না পেঁচাচ্ছেন তিনি। মাঝে মাঝে আড়চোখে বাবাকে দেখছেন। সে চাহনিতেও কেমন যেন কাতরতা, ভীরুতা, অনভ্যাসতা।

ব্যাপারটা টের পেলেন বাবা। উঠে বসলেন তিনি, ঝট করে। এসি বন্ধ ছিল রুমের, চালু করলেন। একটু এগিয়ে এসে, মেয়েটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, আদুরে দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। মাথা নিচু করেই আছেন তিনি। একটা হাত ধরলেন বাবা তার। আলতো করে পাশে বসালেন। কপালে নেমে আসা চুলগুলো যত্ন করে তুলে দিয়ে কী যেন বললেন তাকে। মেয়েটা বেশ লজ্জা পেলেন। কিন্তু বাবা হাসতে থাকেন খুব আনন্দ নিয়ে, প্রাঞ্জলতা নিয়ে।

বাবার রুমে একটা ফ্রিজ আছে, মস্ত বড় ফ্রিজ। বিছানা থেকে নেমে বাবা দ্রুত গতিতে ফ্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, খুললেন, লম্বা একটা বোতল বের করলেন সেখান থেকে। গ্লাসও বের করলেন একটা।

কিছুদিন আগেও দুটো করে গ্লাস বের করতেন বাবা। একটা নিজে

নিতেন, যাকে সাথে নিয়ে আসতেন তাকে দিতেন আরেকটা। কয়দিন আগে একটা মেয়ে গ্লাসের জিনিসগুলো খেতে খেতে বমি করতে শুরু করেন হঠাৎ। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা ঘর ভাসিয়ে ফেলে সে। মহাঝামেলার ব্যাপার। তারপর থেকেই আর দুটো না, একটা গ্লাস।

বোতল থেকে তরলগুলো ঢেলে বাবা গ্লাসটা মুখের কাছে আনলেন। কিন্তু ঠোঁটে ঠেকালেন না। মেয়েটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার ঠোঁটে ঠেকালেন, এবার নিজের ঠোঁটে। এক ঢোঁক গিলে গ্লাসটা রেখে দিলেন পাশে। তারপর খাটে বসে থাকা মেয়েটাকে টেনে তুললেন হাত ধরে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন মেয়েটি। বাবা এবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বললেন, আগের মতো লজ্জা পেলেন তিনি, একটু সরে যাওয়ারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

বাবা হঠাৎ দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে, নায়কোচিত ভঙ্গিতে গান গেয়ে উঠলেন একটা। বেসুরো এবং টান দেওয়ার সময় চিকন হয়ে যাওয়া গলায় হেসে ওঠেন মেয়েটি। লাজুক হাসি। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে, একপলক বাবার দিকে তাকিয়ে, মাথাটা নিচু করে ফেলেন আবার।

গ্লাসটা হাতে নিয়ে বাবা এবার নাচার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা ঠিক নাচ হয়ে দাঁড়ায় না। পাগুলো এলোমেলোভাবে বাবা নাড়াতে থাকেন; ডান হাতে গ্লাস, সাপের মতো মোচড়ানোর চেষ্টা করেন বাঁ হাতটা; মাথাটা কাঁপাতে থাকেন এদিক-ওদিক, শরীরটাও কেমনভাবে যেন দোলাতে থাকেন গাছে ঝুলে থাকা ভাঙা ডালের মতো। একটু ভালো করে খেয়াল করলে মনে হবে, বাবা ঠিক নাচছেন না, তার শরীরের চুলকানির কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, চুলকাতে পারছেন না তিনি, মোচড়াচ্ছেন তাই। বাবা এরপর ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে ফেলে দেন বিছানায়। লাইটটাও অফ করে দেন তার পরপরই।

চোখ সরিয়ে আনি আমি। এবার চোখ রাখি মা'র ঘরের ফুটোতে। বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে আমার সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত বেঁচে থাকা ম্লান হয়ে যায়, অন্ধকার হয়ে যায় চারদিক, শূন্যতা এসে ঘুর ঘুর করে অস্তিত্বে, ভেঙে ফেলে বোধের সব প্রাচীর।

জায়নামাজে বসে আছেন মা। দু'হাত তুলে তাকিয়ে আছেন সামনে। যেন স্রষ্টা বসে আছেন সামনে, অসীম শূন্যে। মা'র ঠোঁট কাঁপছে, চোখ দুটোতে জলের ধারা, সমস্ত চেহারাটা কুঁচকে আছে ছোট হয়ে, কাতরতায় ভরে গেছে সমস্ত অবয়ব।

মা হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন। উঠে দাঁড়ান লাফ দিয়ে। পরনের সমস্ত কাপড় টেনে ছিঁড়তে থাকেন। গোঁ গোঁ শব্দ করে মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকান। চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে মা'র। আস্তে আস্তে সে দুটো আরো বড় হয়ে যাচ্ছে, যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে এখনই।

শরীরটা হিম হয়ে আসে আমার। বুকের ভেতরটা তিরতির কাঁপুনিতে নিস্তেজ হয়ে গেছে। কোনো অনুভূতিই আর কাজ করছে না এ মুহূর্তে। উপুড় হয়ে মা জায়নামাজে মাথা গুঁতাচ্ছেন, ডাস ডাস শব্দ হচ্ছে মেঝের সঙ্গে। আর একটু, আর একটু হলেই ফেটে যাবে মাথাটা।

দ্রুত ওখান থেকে সরে আসি ঘরের মাঝখানে। থমকে দাঁড়াই। চোখ বুজে, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরি দু'কান। সমস্ত অনুভব দিয়ে চেষ্টা করি কোনো কিছু না দেখার, না শোনার। তবুও চোখের সামনে ভেসে ওঠে—বাবার বাহুলগ্নে নতুন নতুন নারী; জায়নামাজে বসে মা'র আকুলতা, ব্যাকুলতা। বাবার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, মা'র করুণ-স্বরের কান্না। আমি এক নিশ্ছিদ্র বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাই। মাকড়সার পতঙ্গকে পেঁচিয়ে ফেলার মতো সমস্ত পঙ্কিলতা পেঁচিয়ে ধরে আমাকে। দম বন্ধ হয়ে আসে আমার, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, ফেটে বের হয়ে আসতে চায় বুকের ভেতরটা।

চিৎকার করে উঠি আমি হঠাৎ-'বন্ধ করুন আপনাদের অভিনয়, বন্ধ করুন আপনাদের ভণ্ডামি, নিছক কাঙালিপনা, বন্ধ করুন। স্টপ!'
চার দেয়ালে বাধা পেয়ে আমার চিৎকার ফিরে আসে আমার কাছেই। আমিই থেমে যাই, স্তব্ধ হয়ে যাই। নতজানু হয়ে, দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে, কেঁদে উঠি নিঃশব্দে। তারপর, অনেকক্ষণ পর, বিড়বিড় করে বলি—খুন করব আমি একটা! খুন!

রাজন্যাদের বাসায় সাদা ধবধবে ছোট্ট কুকুর আছে একটা। জুতো খুলে সোফায় বসতেই কোথা থেকে যেন কুকুরটা এসে হাজির হয় আমার সামনে। আমার দু'পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো চাটতে থাকে জিভ দিয়ে। প্রচণ্ড সুরসুরি লাগে আমার, পা সরিয়ে নিই না তবুও। বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চাটার পর পায়ের কাছেই বসে পড়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে। রাজন্যা প্রায়ই হাসতে হাসতে বলে, 'সম্ভবত তোমার পায়ের ওই আঙুল দুটো দিয়ে মধু ঝরে।'

'ঝরতে পারে।' আমিও হেসে হেসে বলি।

'ঝরতে পারে না, সত্যি সত্যি ঝরে। না হলে তোমার ওই নখ দুটো ও এভাবে চাটবে কেন! কই, আমার পা তো ছুঁয়েও দেখে না।'

'তোমার পা সত্যি ছুঁয়ে দেখে না?'

'না। দেড় বছর হলো কুকুরটা বাসায় এসেছে, কই একদিনও পায়ের কাছে আসল না। মাঝে মাঝে আমি কোলে নিতে চাই, কোলেও আসতে চায় না। শুধু খিদে পেলে ঘুরঘুর করে পেছন পেছন।'

'ওটা তো মেয়ে কুকুর?'

'হ্যাঁ।'

রাজন্যার নাকটা টেনে দিয়ে বলি, 'সে জন্যই ও তোমাকে তেমন পছন্দ করে না। প্রকৃতির ধারাবাহিকতায় মেয়েরা পছন্দ করবে ছেলেদের, ছেলেরা মেয়েদের।' হাসতে থাকি আমি।

কুকুরটা আজও পায়ের কাছে এসেছে। কিন্তু পায়ে মুখ দিতে পারল না ও। তার আগেই রাজন্যা আমার হাত টেনে ধরে বলল, 'বেড রুমে আসো, তোমার সঙ্গে অদ্ভুত কিছু কথা বলব আজ আমি।'

হাত ধরেই আমাকে বেড রুমে নিয়ে এলো রাজন্যা। দরজাটা বন্ধ করে দিল তারপর। যদিও এটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনটা কাজের মেয়ে

আর ওর বাবা—এ নিয়েই ওদের সংসার। বাবা বাইরে থাকেন অধিকাংশ সময়, কাজের মেয়েগুলোরও এক তলা থেকে দোতলায় আসা নিষেধ।

খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে আজ রাজন্যাকে। হরিণের চঞ্চলতায় পা দুটো, অথচ বিড়ালের নিঃশব্দতা। ঘরের সব ভারী পর্দাগুলো ভালো করে মেলানোই ছিল, হাত দিয়ে আরো একটু মেলে দিল, টান টান করল। বিকেলে রোদ আসা বারান্দার দরজাটাও বন্ধ করে দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল পুরো ঘর।

দরজাকে পেছনে ফেলে রাজন্যা ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। মুখে দুষ্টুমির হাসি। আলস্য ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো আমার দিকে। আলতো করে সামনে বসে একটা হাত রাখল আমার গালে। খুব নরম গলায় বলল, 'খুব টেনশ মনে হচ্ছে তোমাকে। কেন?'

শিরদাঁড়া টান টান করলাম আমি, সোজা হয়ে বসলাম। কিছুটা নির্ভার ভঙ্গিতে বললাম, 'তাই! কিন্তু তোমার সামনে এসে আমি কখনো টেনশ অনুভব করিনি, এখনো না। সুযোগ পেলেই তাই তো ছুটে আসি তোমার কাছে, পাশে বসি তোমার। তোমাকে দেখি, তোমার পরিস্ফুটতা দেখি।'

দু'হাতের ভেতর আমার একটা হাত টেনে নিয়ে চোখের দিকে তাকায় ও। মুগ্ধতা ওর চোখে, আমার চোখেও। কী শান্ত, স্নিগ্ধ, স্থির একটা মেয়ে। কে বলবে, এই মেয়েটার মা থেকেও নেই। এ মেয়েটাকে ফেলে যে তার মা অন্য একজনের ঘরে চলে গেছে। কে বলতে পারবে তাকে দেখে! কী যে মায়া—চোখে, অবয়বে, স্পর্শে।

রাজন্যা আরো কাছ ঘেঁষে বসে আমার। হাতটা আরো একটু চেপে ধরে। তারপর দূরাগত গলায় বলে, 'চলো না, দূরে কোথাও চলে যাই।'

আমি একটু হেসে বলি, 'কত দূরে?'

'অনেক দূরে।'

'অনেক দূরে?' এবার আমার দু'হাতে ওর দুটো হাত চেপে ধরি, 'অনেক দূরটা ঠিক কত দূর, রাজকন্যা?' পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমি ওর দিকে তাকাই, 'মানুষের দীর্ঘশ্বাস যেখানে পৌঁছায় না। স্বপ্নভঙ্গ আর রূঢ় জটিলতার কোনো স্পর্শ নেই যেখানে। যেখানে প্রজাপতি আর বর্ণিল ফুল খেলা করে মানুষের সঙ্গে।' আমি একটু থেমে বলি, 'বলো?'

পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে রাজন্যা আমার দিকে। নিজের ঠোঁট দুটো চেপে রাখে অনেকক্ষণ। হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলে ও, 'মাম, ফোন

করেছিল কাল। কি বলেছি জানো?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমি ওর দিকে তাকাই।

'আই অ্যাম ক্যারিইং।' কথাটা শেষ করেই রাজন্যা আমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে থাকি আমি। বরং হাত দুটোতে মায়া ছড়িয়ে বলি, 'কথাটা বলে তোমার ভালো লেগেছে?'

'খুব, খু-ব।' উচ্ছল হয়ে ওঠে রাজন্যা, 'দম আটকে আসছিল রাফিদ। জমাট বেঁধে যাচ্ছিল বুকের ভেতরটা। কাউকে না কাউকে কথাটা বলা দরকার। কাকে বলব, বলো?'

'মাম কিছু বলেছেন?'

'চুপ হয়ে ছিল অনেকক্ষণ।'

'কিছুই বলেননি!'

'বলেছে।' রাজন্যা একটু থেমে থেকে বলে, 'খুব নির্ভারভাবে বলেছে, তোমার ভেতর কি কোনো অপরাধবোধ কাজ করছে, রাজন্যা?'

'অ্যানসার করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। আমি বলেছি, না।'

'তারপর?' আমার ভেতর চঞ্চলতা শুরু হয়ে গেছে। রাজন্যার দিকে কাতর হয়ে ঝুঁকে বলি, 'তারপর কী বলেছেন তিনি?'

'বলেছে, তাহলে ঠিক আছে। কোনো কাজ করে যদি অপরাধবোধেই ভুগতে হয়, সে কাজটা তাহলে না করাই উচিত।'

'মাম জানেন, হু ইজ দ্য গাই?

'জানেন।'

বুকের ভেতরটায় ঝড় শুরু হয়ে গেছে আমার। কিন্তু সেটা বুঝতে দিতে চাই না আমি ওকে। রাজন্যা টের পেল সেটা। উঠে এসে আমার পেছনে বসল। আলতো করে জড়িয়ে ধরে পিঠে মাথা ঠেকাল ও। আমার ভেতর অশান্ত কিছু দেখলেই ও এই কাজটা করে। আমি শান্ত হয়ে যাই, পরম যত্ন নিয়ে ও তখন মাথার চুলগুলোতে হাত বুলাতে থাকে।

চুলে হাত বুলাচ্ছে রাজন্যা। বেশ কিছুক্ষণ পর আলস্য গলায় ও বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি মামকে।'

কিছু বলি না আমি। চুলে হাত বুলানোটা অনুভব করি।

'কী জিজ্ঞেস করেছিলাম—।' চুলে হাত নাড়ানোটা বন্ধ করে রাজন্যা বলে, 'সেটা কি তোমার শুনতে ইচ্ছে করছে, রাফ?'

'করছে।'

চুলে আবার হাত বুলাতে থাকে রাজন্যা। অনেকক্ষণ। হঠাৎ শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'মামকে বলেছিলাম, তুমি কি কোনো অপরাধবোধে ভোগো, মাম? ঝট করে মাম জবাব দিয়েছিল, না। তারপর আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলাম।'

হাত ধরে পেছন থেকে রাজন্যাকে আমার সামনে নিয়ে আসি। চোখ দুটো কেমন যেন বিষণ্ন। ওর ডান চোখের কোনায় আমি আমার ডান হাতটা ছুঁয়ে বলি, 'মনটা খারাপ হয়ে গেছে, না?'

'নাহ্।' দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায় শব্দটা।

'তাহলে?'

'মাম খুব দুঃখী দুঃখী গলায় আমাকে বলেছিল, তুমি কি জানতে চাও, তোমার বাবাকে ছেড়ে আমি কেন চলে এসেছি?'

'তুমি জেনেছ?' কিছুটা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করি রাজন্যাকে।

'না। জানতে ইচ্ছে হয়নি আমার।' রাজন্যা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'বলো তো আমার বয়স কত?'

কয়দিন আগে রাজন্যার জন্মদিন গেছে। মনে করলাম সেই দিনটা, হিসাবটাও করে ফেললাম মনে মনে, 'উনিশ বছর এক মাস নয় দিন।'

'আঠার বছরের চেয়ে পুরো এক মাস নয় দিন বেশি, না?' রাজন্যার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

ইতস্তত ভঙ্গিতে বলি, 'হ্যাঁ।'

'আঠার বছর হলেই তো মেয়েরা বিয়ে করতে পারে, তাই না?' রাজন্যা একটু থেমে বলে, 'চলো না বিয়ে করে ফেলি।'

মুখটার দিকে ভালো করে তাকাই আমি রাজন্যার। খুব স্বাভাবিক, কেবল চোখ দুটো একটু হাসছে। আমি বুঝতে পারি না, রাজন্যা কতটুকু সিরিয়াস? না, কেবল কথার কথা এটা? ব্যাপারটা ধরে ফেলে ও। শব্দ করে হেসে উঠে বলে, 'চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখেছ?'

'হ্যাঁ, অনেক আগেই তো রাত হয়ে গেছে। লাইট জ্বালাবে না?'

'না।' রাজন্যা রহস্যময় গলায় বলে, 'আজ তোমাকে একটা জিনিস শোনাব এবং বুঝাব।'

বুকের ভেতরটা আবার কেঁপে ওঠে আমার। কিন্তু রাজন্যার চেহারায় দুষ্টুমির হাসি, রহস্যেরও। ঘরের চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে ও খুব উদাস গলায় বলে, 'কেমন অন্ধকার! মানুষের ভেতরটা—।' রাজন্যা আমার একটা হাত নিয়ে ওর পেটে ঠেসে ধরে বলে, 'এর ভেতরটা আরো বেশি

অন্ধকার, না? অথচ কী আশ্চর্য, এই অন্ধকারে, প্রকট অন্ধকারে, বেড়ে উঠছে একজন, বড় হচ্ছে কেউ, ভাবতেই অবাক হয়ে যাই। রাফ, প্রিয় রাফ, তুমি কি একবার আমার এখানে একটু কান রাখবে? খুব মনোযোগ দিয়ে রেখো, একটা কিছু শুনতে পাবে, অদ্ভুত কিছু শুনতে পাবে। আমার অবশ্য কান ঠেকাতে হয় না। আমি এমনিই শুনতে পাই। বুদ্বুদ তোলার মতো কে যেন কথা বলে, কে যেন সারাক্ষণ শব্দ করে। আমার এত ভালো লাগে, রাফ! আনন্দে চোখ দুটো ভিজে আসে! মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—অনলি নিড দিজ সাউন্ড, নাথিং এলস!'

আলতো করে বিছানায় শুইয়ে দেই আমি রাজন্যাকে। তারপর একটু ঝুঁকে বসে মাথাটা কাত করে দেই ওর পেটের ওপর। জানি, কোনো শব্দ শুনতে পাব না আমি, কারণ ভ্রূণ কখনো শব্দ করতে পারে না। তবুও কান পেতে রইলাম আমি, অধীর আগ্রহে মাথাটা মেলে রাখলাম—যদি কিছু একটা শুনে ফেলি, যদি কেউ কিছু একটা বলে! আমার আত্মজের শব্দ-উপস্থিতির জন্য আমি অপেক্ষা করতে থাকি অনেকক্ষণ!

খুব কাতর গলায় লোকটি বললেন, 'ইয়ংম্যান, একটা কথা বলতে পারি?'

রাজন্যাদের বাসা থেকে বের হতেই মনে হলো, একটা পুলিশের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ছোট-বড় কোনো পরিচিত পুলিশ নেই আমার। ভাবতে ভাবতে বনানী থানার সামনে এসে, গাড়ি থেকে নেমে, দু'পা এগিয়েছি, লোকটার কথা শুনলাম, ঘুরে দাঁড়ালাম। বয়স বোঝা যাচ্ছে না তার। পঞ্চাশও হতে পারে, আবার ষাটও হতে পারে। মানুষের চেহারা দেখে কেন যেন আজকাল বয়স বোঝা যায় না তেমন। এখন তো রাত, এখন আরো বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটার চেহারাও কাতরতায় ভরা, হাসিও লেগে আছে মৃদু। হাত কচলাচ্ছেন ধারাবাহিকভাবে। সারা শরীরে এক ধরনের ক্লান্তি। সম্ভবত আমি জানি, কী বলবেন উনি আমাকে।

বাজে একটা অভ্যাস আছে আমার—সময় নেই, অসময় নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। দুটো কারণে এটা হতে পারে। এক. ছোটকালে স্কুল পালিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতাম। কলেজে উঠেও করেছি। ভার্সিটিতে উঠেও করছি। দুই. বাসার ভেতর বেশিক্ষণ ভালো লাগে না আমার। দম বন্ধ হয়ে আসে। কোনো ফুডসের দোকানেও ভালো লাগে না। বদ্ধ কোনো

জায়গাতেও না। পার্কেও বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। অগত্যা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় আমাকে। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ইদানীং মানুষ দেখতে ভালো লাগে, মানুষের কথা শুনতে ভালো লাগে।

এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে হাঁটছি একদিন। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামে আমার পাশে। চমকে উঠি আমি। এই রোডে, ফাঁকা জায়গায়, প্রায়ই ছিনতাই হয়। কিন্তু গাড়িটার দিকে ভালো করে তাকাতেই আশ্বস্ত হলাম—বাবার গাড়ি। উইন্ডস্ক্রিন সরিয়ে বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এভাবে হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছো?'

'কোথাও না।'

'তাহলে হাঁটছ কেন?'

'হাঁটতে ভালো লাগছে।'

'মহাপুরুষদের হাঁটতে ভালো লাগে, তুমি তো মহাপুরুষ না।'

'মহাপুরুষ হতে একটু বয়স লাগে, বাবা। আমার এখনো সেই বয়স হয়নি। বয়স হলে বোঝা যাবে আমি মহাপুরুষ, না সাধারণ পুরুষ।'

'তোমার নিজের পছন্দের একটা গাড়ি কিনে দিয়েছি আমি; তোমার উড়নচণ্ডি বড় ভাইয়ার জন্যও একটা আছে;, তোমার যে বোনটা তোমাদের ভুলে চলে গেছে, তার গাড়িটাও পড়ে আছে গ্যারেজে। আর তুমি রাস্তায় বের হয়েছ হেঁটে হেঁটে চলার জন্য! গাড়িতে উঠে এসো। তুমি যেখানে যেতে চাও নামিয়ে দিয়ে আসি।'

'আমি কোথায় যেতে চাই সেটাই তো জানি না। আপনি যান। আরো কিছুক্ষণ হেঁটে বাসায় চলে যাব আমি।'

গাড়ি থেকে নেমে এলেন বাবা। আমার সামনে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি বেশি কথা বলছ, রাফিদ!'

বাবার চোখের দিকে ভালো করে তাকালাম আমি, 'জি বাবা।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ বেশি কথা বলা পাগলের লক্ষণ?'

'জি, মাকে দেখে বুঝতে পেরেছি।'

'তোমার মায়ের কথা বলছি না, আমি তোমার কথা বলছি।'

'আমি তো মা'রই একটা অংশ, বাবা। বরং আমারই অবাক লাগছে—আপনার বেশি কথা বলা দেখে। অথচ আপনার সঙ্গে আমার কথাই হয় না। আপনার মনে আছে, গত এক মাসে আমার সঙ্গে কয়টি কথা বলেছেন আপনি বাসায়? সময় হয়েছে আপনার কয়েক সেকেন্ড?'

বিব্রত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকান বাবা। একটু রাগও আছে সেই

দৃষ্টিতে। কয়েক সেকেন্ড। বাবা যেভাবে গাড়ি থেকে নেমেছিলেন, সেভাবেই আবার উঠে চলে যান। আমি আবার হাঁটতে থাকি। এভাবে হাঁটতে হাঁটতেই একটা পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমার। অল্প বয়সী ঘোমটা পরা একটা মহিলা, বিধ্বস্ত একটা পুরুষ, আর মলিন চেহারার দুটো বাচ্চা। ঢাকায় এসেছিলেন একটা কাজে, কিন্তু পথে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। কুমিল্লায় বাড়ি তাদের, বাড়ি ফেরার কোনো টাকা-পয়সা নেই তাদের।

কথাগুলো শুনে মন খারাপ হয়ে গেল আমার। খুব ভালো করে তাদের দিকে তাকালাম, মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। একটু আন্তরিক হয়ে বললাম, 'আমার একটা গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, আপনাদের কুমিল্লায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। যাবেন আপনারা গাড়িতে?'

কিছু বললেন না তারা। আমি টের পেলাম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তারা কেমন যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছে। যা বোঝার বুঝে গেলাম আমি। পরে এ রকম আরো কয়েকবার হয়েছে, কেউই আমার গাড়িতে যেতে চায়নি, টাকা চেয়েছে। বেঁচে থাকার অন্য রকম কৌশল। সবাই বেঁচে থাকতে চায়, যে যেভাবে পারছে বেঁচে থাকছে। হায়, কেবল আমারই বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না!

কয়দিন আগে একটি মহিলা এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। যথারীতি ঘোমটা দেওয়া। হাতে একটা বাঁশের কুলো। কুলোটা সুন্দর করে সাজানো। কয়েকটা টাকাও আছে তার ওপর। মহিলা বললেন, তার মেয়ের বিয়ে, সাহায্য চান। ঝট করে সব কিছু জেনে নিয়ে মহিলাকে বললাম, 'চলুন, আপনার বাসায় যাব, আপনার যে মেয়েটাকে বিয়ে দেবেন তাকে দেখব।' মহিলা রাজি হলেন। আধা ঘণ্টার মধ্যে কেরানীগঞ্জ চলে এলাম আমরা। সত্যি সত্যি মেয়ের বিয়ে। একটা বিয়েতে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে—রাজন্যাকে এটা বলতেই হেসে খুন ও। সমস্ত বিয়ের খরচ আমি আর ও দিয়েছিলাম, বিয়েতেও ছিলাম আমরা। মানুষ যে কত আন্তরিক, ওই বিয়েতে না থাকলে আমি হয়তো কোনোদিনই বুঝতাম না। সঙ্গে করে নিয়ে আসা সাজানোর সব সরঞ্জামাদি দিয়ে রাজন্যা কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ বসে সাজিয়ে দিয়েছিল মেয়েটাকে। মেয়েটা একটু পর পর কেঁদে উঠছিল—আবেগে, আনন্দে। রাজন্যাও।

লোকটার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। কী চান তিনি, তার জন্য অপেক্ষা করছি। হাত কচলাতে কচলাতে তিনি বললেন, 'আপনি কি থানার ভেতর যাচ্ছেন?'

'জি।' ছোট্ট করে উত্তর দিলাম আমি।

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'জি বলুন।'

পাশে একটা অন্ধকার মতো জায়গার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'একটু ওদিকে দাঁড়িয়ে কথা বলি?'

অন্ধকার জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি, উনিও। হাত কচলানো চলছেই তার। একপলক আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বললেন, 'একটা সমস্যায় পড়েছি আমি। সকালে আমার মেজ ছেলেটাকে ধরে আনা হয়েছে এই থানায়। নেশা করে সে। ছাড়াতে এসেছি আমি। কিন্তু তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দরকার।'

'আপনার ছেলে নেশা করে, তাকে আবার ছাড়াতে এসেছেন!'

বেশ লজ্জা পেলেন লোকটি। লজ্জামাখা চেহারা নিয়েই বললেন, 'বাবা তো। বাবাদের বুকের ভেতর সব ছেলের জন্যই পোড়ায়, কাঁদে। আপনি যেদিন বাবা হবেন, তখনো এই ব্যাপারটাই ঘটবে।'

ভালো লাগল কথাটা। 'আপনার বাসা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মুগদাপাড়ায়। ওখান থেকে এসে নেশা করত ও। বনানীর কোথায় কোথায় যেন এসব পাওয়া যায়। খুব লজ্জার মধ্যে আছি।'

'আপনার কাছে টাকা নেই, এই তো?'

'না, আছে। তবে পুরোটা নেই। তিন হাজারের কিছু উপরে আছে। রাত নয়টার মধ্যে পুরোটা দিতে না পারলে কোর্টে চালান হওয়ার কাগজপত্র তৈরি হয়ে যাবে। ছাড়ানোটা মুশকিল হবে তখন। দৌড়াদৌড়ি করতে হবে কোর্টে। এদিকে মুগদা গিয়ে যে বাকি টাকাটা নিয়ে আসব, সেটাও সম্ভব না। কারণ বাসায় টাকা নেই। কিছু টাকা আছে ব্যাংকে, রাতে তো সেটা তুলতে পারব না। তুলতে হবে দিনে, কালকে। ততক্ষণে—।' লোকটা আরো কাতর হয়ে বলেন, 'দু'হাজার টাকা ধার চাইব সে রকম মানুষও নেই আমার।'

'আপনার ছেলে কার আন্ডারে আছেন?'

'সেকেন্ড অফিসার জনাব মুশফিকুর রহমানের আন্ডারে।'

'উনিই টাকাটা চেয়েছেন?'

'জি।'

পকেট থেকে দু'হাজার টাকা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বললাম,

'যান ব্যবস্থা করুন। আমি এখানে আছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে লোকটা আবার আমার সামনে এলেন। মুখে বিজয়ীর হাসি। তার পেছনে অপরাধী চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে তার নেশাখোর ছেলেটা। ঝট করে আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, 'অনলি ম্যান ক্যান হেল্প দ্য আদার ম্যান। আজ আবার এটা প্রমাণ হলো। মুগদাপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক আমি। আপনি যদি আপনার বাসার ঠিকানা আর আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিতেন, কালই টাকাটা ফেরত দিয়ে আসতাম। মানুষের উপকার কোনো কিছু দিয়েই শোধ করা যায় না। আমিও শোধ করতে পারব না। আমি কেবল আপনার জন্য দোয়া করতে পারি—।' লোকটা হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে উঠে, হাত দুটো উপরে তুলে বলেন, 'হে পরওয়ারদেগার, তুমি তোমার এই বান্দাকে সারাজীবন সুখে রেখো। অনেক সুখে রেখো।'

হেসে উঠল আমার ভেতরটা। সুখ যদি বস্তা ভরা কেনা যেত, তাহলে আমার মতো সুখী আর কেউ হতো না, আমার মায়ের মতোও না।

পরম মমতা নিয়ে ছেলের একটা হাত ধরে লোকটা চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার সামনে এলেন আবার। সারা চেহারা হাসি হাসি করে বললেন, 'একটা ধাঁধা শিখিয়ে যাই আপনাকে। বলুন তে—

I am 10 letters word
The first four 1234 has power to rule
You eat my 5678
My 89 and 10 means of a lady,
Also I can fly...

What am I?'

বোকার মতো চেয়ে রইলাম আমি লোকটার দিকে। তিনি চেহারাটা আরো হাসি হাসি করে বললেন, 'Kingfisher, বাংলায় বলে মাছরাঙা। আপনি কি জানেন, ছয় সদস্যের একটা মাছরাঙা পরিবার দিনে মোট কয়টা মাছ খায়?' শিক্ষক মানুষটি শিক্ষকের মতোই উত্তরটা দিলেন, '১০০টা।'

সেকেন্ড অফিসার মুশফিকুর রহমানের চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না। চেয়ারে বসে তিনি একটি সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ছেন। ম্যাগাজিনটা দু'হাত দিয়ে এমনভাবে মুখের সামনে মেলে ধরেছেন, যেন ম্যাগাজিনের কোনো ছবির

সঙ্গে গোপন কিছু কথা বলছেন তিনি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খুক করে কাশি দিলাম আমি। ম্যাগাজিনটা চেহারার সামনে থেকে না সরিয়েই তিনি বললেন, 'কাজ থাকলে ভেতরে আসুন, না থাকলে ডিস্ট্রার্ব করবেন না।'

ভেতরে ঢুকলাম আমি। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বসতে পারি?'

'বসুন। সামনে দুটো চেয়ার খালি আছে।' ম্যাগাজিনটা এখনো চেহারার সামনে, আগের মতোই উঁচু করে ধরা।

'দু-একটা কথা জানতে এসেছি আমি। প্লিজ, আপনি যদি একটু—।' বাক্যটা শেষ করতে হলো না আমাকে। ম্যাগাজিনটা সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুশফিকুর রহমান সাহেব একটু সোজা হয়ে বসলেন। বাবা আমাকে একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছেন, সতের হাজার আটশ টাকা দাম। টি শার্টটাও বাইরে থেকে এনে দিয়েছেন, প্যান্ট এবং জুতোটাও। পোশাকের যে মূল্য আছে সেটা তো পারস্য কবি শেখ সাদি অনেক আগেই প্রমাণ করে গেছেন।

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন আপনি, প্লিজ বসুন।' বেশ আন্তরিক শোনাল মুশফিকুর সাহেবের গলা।

'থ্যাংকু।' চেয়ারে বসলাম আমি।

'সরি। একটা নায়িকার কাহিনি পড়ছিলাম। বেশ মজা লাগছিল তো, চোখের সামনে থেকে পত্রিকাটা তাই সরাতে পারছিলাম না।'

'নায়িকাদের কাহিনি পড়তে বেশ মজাই লাগে।'

'এই কাহিনিটা আবার অন্য রকম। এই মাতারি এক জায়গায় বলেছে, সিনেমায় আসার আগে সে যেমন লাজুক ছিল, এখনো নাকি তেমনই আছে।' ম্যাগাজিনটা আমার দিকে মেলে দিয়ে বললেন, 'দেখেন তো, কাপড়-চোপড়ের অবস্থা! ওকে দেখে কি মনে হয় লজ্জবতী মেয়ে এটা?' ম্যাগাজিনটা সরিয়ে নিয়ে তিনি কী একটা লেখা খুঁজতে খুঁজতে বলেন, 'আরো একটা জায়গায় কী বলেছে জানেন, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাকি সে তাজা পাকা আমের জুস ছাড়া নাস্তা করতে পারে না। নখরামির একটা সীমা আছে। আরে মাতারি, তাজা পাকা আম তুই কই পাস? তোর বাপের কি আম বাগান আছে? বাজারে যত আম পাওয়া যায় তাতে ক্ষতিকর সব ওষুধ-মসুদ দিয়ে ভরা। আরো একটা কথা—তাজা পাকা আম কয় মাস

পাওয়া যায়? খুব বেশি হলে তিন মাস। বাকি নয় মাস কি না খেয়ে থাকা হয়! যত্তোসব ভণ্ডামি!' মুশফিকুর সাহেব চেহারা সিরিয়াস করে কথা বলছিলেন। হঠাৎ হাসি হাসি করে বললেন, 'চা খাবেন তো? এখানে ভালো রং চা পাওয়া যায়।'

'রং চা আপনার পছন্দ?'

'ঠিক পছন্দ যে সেটা বলব না। রং চায়ের দাম একটু কম তো, তাই খাই। দিনে দশ-বারো কাপ খাই, গেস্টদেরও খাওয়াতে হয়। কত টাকাইবা বেতন পাই আমরা। আপনার হয়তো ধারণা আছে। যা পাই, তা দিয়ে নিজেদেরই চলা মুশকিল। গ্রামে বাবা-মাকেও কিছু পাঠাতে হয়। বড় কষ্টে আছি রে ভাই, মহামসিবত!'

'কোনো এক্সট্রা ইনকাম নেই আপনাদের?'

'আছে। অনেকেই করে। আমি ভাই ওসবের মধ্যে নেই। এই তো কিছুক্ষণ আগে, আপনি আসার ঠিক কয়েক মিনিট আগে, একটা নেশাখোর ছেলেকে ছেড়ে দিলাম। কোনো টাকা-পয়সা নেইনি।'

'কোনো টাকা-পয়সা নেননি?'

'একটা টাকাও নেইনি। আপনি আমার পকেট সার্চ করতে পারেন। অবশ্য ড্রয়ারে হাজার পাঁচেক টাকা আছে। আমার এক কলিগ রেখে গেছে, একটু পর এসে নিয়ে যাবে।'

হাসি আসছে আমার, হেসেও ফেললাম একটু। মুশফিকুর সাহেব কিছুটা বিব্রত হয়ে বললেন, 'কী যেন জানতে এসেছেন আপনি?'

সোজা হয়ে বসলাম আমি, মুশফিকুর সাহেবও সোজা হলেন।

'আচ্ছা, এখানে, মানে থানায় পুলিশের কাছে সাধারণত কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে মানুষ বেশি আসে?'

মুশফিকুর সাহেব একটু ভেবে বললেন, 'মোটামুটি পাঁচ ধরনের সমস্যা নিয়ে পাবলিক থানায় আসে। সবচেয়ে বেশি আসে ঝগড়া-বিবাদ ও জাল-জালিয়াতির সমস্যা নিয়ে। তারপর ধরেন চুরি, ছিনতাই ও দস্যুতা-ডাকাতির সমস্যা। সবচেয়ে কম আসে খুনসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে।'

'কম হলেও খুনসংক্রান্ত সমস্যা ঠিক কেমন আসে?'

'একেবারেও কম না।'

'খুন তো অনেকভাবে হয়ে থাকে, সাধারণত কোন ধরনের খুন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে?'

'খুন তো হয়ই তিনভাবে। গুলি করে বা কিছু দিয়ে কুপিয়ে, এটা সাধারণত ভাড়াটে খুনিরা করে থাকে। গাড়ি চাপা দিয়ে যে খুন, তা তো ড্রাইভাররা করে থাকে। বিষ খাইয়ে খুন করে সাধারণত কাছের মানুষরা।'

'গলায় দড়ি ঝুলিয়ে—।'

হাত দিয়ে আমাকে থামিয়ে দেন মুশকিফকুর সাহেব, 'গলায় দড়ি ঝুলিয়ে মারা খুব কঠিন। সাধারণত বিষ খাইয়ে কিংবা অন্য কোনোভাবে মেরে তারপর লাশের গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয় অনেকে।'

'সব খুনি ধরা পড়ে?'

'না। তবে যেসব খুন কাছের মানুষরা করে, সেই ক্ষেত্রে আশপাশের অনেকেরই ঝামেলা পোহাতে হয়।' মুশফিকুর সাহেব হঠাৎ গভীর চোখে আমার দিকে তাকান, 'আপনি কোনো খুন-টুন করবেন নাকি?'

'আপনার কি মনে হচ্ছে—আমি কোনো খুন করব?'

'ঠিক তা না। তবে একটা কথা বলি আপনাকে, খুন করার পর খুনিরা কোন ভুলটা সবচেয়ে বেশি করে জানেন?'

'যেহেতু আমি কোনো খুন করছি না, সেহেতু ওটা জানার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। আমি বরং আপনাকে একটা ধাঁধা বলি, দেখুন তো ধাঁধার উত্তরটা বের করতে পারেন কিনা।' মুগদাপাড়ার ইংরেজি শিক্ষক সাহেবের ধাঁধাটা শুনিয়ে দিলাম আমি মুশফিকুর সাহেবকে। উত্তর না-জানা সবার মতোই বোকা-চাহনিতে চেয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে।

উঠে দাঁড়ালাম আমি চেয়ার থেকে। মুখে হাসি লেগে আছে আমার, সেই হাসি নিয়ে আমি বললাম, 'ধাঁধার উত্তরটা বের করার চেষ্টা করুন। কিছুদিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার। উত্তরটা তখন জেনে নেব।'

বোকার মতো এখনো চেয়ে আছেন মুশফিকুর সাহেব। আমি তাকে ধাঁধায় ফেলে দেওয়ার জন্য বললাম, 'সেও কোনো কোনো মানুষের মতো শিকার ধরার জন্য চুপচাপ বসে থাকে। মুগদাপাড়ার ইংরেজি শিক্ষককে যেভাবে কেউ ঠোকর দিয়েছে, বাগে পেলে সেও সেভাবে ঠোকর দেয় শিকারকে!'

দুই আঙুলের মাঝখানে সিগারেটটা কাঁপছে বাবার। তিন মিনিট আগে আমার রুমে যখন ঢুকেছিলেন, তখনো একটা সিগারেট ছিল আঙুলের ফাঁকে। দেড় মিনিটের মাথায় সেটা শেষ করে এটা ধরিয়েছেন। কিন্তু একবার টান দিয়ে সেই যে মুখ থেকে সরিয়েছেন, আর মুখে দেননি। সিগারেটের মাথায় ছাই জমেছে লম্বা হয়ে, একটু একটু করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি ঝরে পড়ল, কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না তা মাটিতে।

উদ্ভ্রান্তের মতো পায়চারি করছেন বাবা। তিন মিনিট আগে, রুমে ঢুকেই, প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে। আমি বলব, তুমি শুনবে, কিন্তু চুপ হয়ে থাকা যাবে না তোমার। প্রতিটা কথার জবাব দিতে হবে তোমাকে। পুতুলের মতো শুধু মাথা ঝাঁকাবে না, হ্যাঁ-হুঁ করবে না। সঠিকভাবে জবাব দেবে। এবার দেখো সময় কত?'

ঘড়ি পরেন না বাবা। কিন্তু বাবার অভ্যাস হচ্ছে, একটু পর পর সময় জিজ্ঞেস করা। আমি বললাম, 'একটা বেজে সতের মিনিট।'

গলা গম্ভীর করেই বাবা বললেন, 'সরি। এখন প্রায় মাঝরাত, ঢাকা শহরের অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সম্ভবত তুমিও এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু কথাগুলো বলা প্রয়োজন। সকালবেলা বলা যেত, কিন্তু কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আমার।'

বাবার কথা শোনার অপেক্ষায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আমি। মনোযোগ দিয়ে পায়চারি করছেন বাবা, ভাবনা মিশ্রিত পায়চারি। আরো কয়েকবার পায়চারি করে আপনমনে সিগারেটটা মুখে দিলেন তিনি, নিভে গেছে সেটা। আঙুলের ফাঁকে রেখে দিলেন তবু। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমার বড় ভাই এখন কোথায় আছে জানো?'

'না তো, বাবা!'

'কখনো জানার চেষ্টা করেছ?'

'করেছি। প্রায়ই তো কথা হয়। ভাইয়াই ফোন করে।'

'গত দু'দিন ফোন করেছিল তোমাকে?'

'না।'

'করবে কীভাবে, সে তো এখন থানায়। পুলিশ আটক করেছে তাকে।'

বুকের ভেতরটা বেশ জোরালোভাবেই কেঁপে উঠল আমার। ভাইয়াকে এর আগেও বেশ কয়েকবার আটক করেছে পুলিশ। ছাড়িয়েও আনা হয়েছে যথাসময়ে। কিন্তু কোনোবারেই জানতে পারিনি কেন তাকে পুলিশ আটক করে। বাবাও বলেননি, ভাইয়াও না।

'আমাকে এখন কী করতে হবে?'

'কিচ্ছু না। রাবিদ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। কেউ ওকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করবে না। আমি তো করবই না।'

'বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজসেবক আসিফুজ্জামান খানের ছেলে থানায় আটক অবস্থায় থাকবে ব্যাপারটা কেমন দেখায় না! আর মানুষইবা ভাববে কি, আপনার স্ট্যাটাসটাইবা ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

বাবা একটু এগিয়ে এসে ঠিক সামনে দাঁড়ান আমার। চোখ দুটো একটু সরু করে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকান, 'তুমি কি মনে করো আমার স্ট্যাটাস খুব ঠুনকো? একটু চাপ দিলেই পাটখড়ির মতো ভেঙে যাবে সেটা?'

'পৃথিবীর কোনো কিছুই স্থায়ী না বাবা। এমনকি ওই উঁচু উঁচু পাহাড়ও না। আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে সেগুলো। বাবা—।' মাথা নিচু করে কথা বলছিলাম এতক্ষণ, উঁচু করে বাবার দিকে তাকাই, 'মানুষ নিজেই যেহেতু চিরন্তন না, তার পারিপার্শ্বকতাগুলোরও তাই টিকে থাকার কোনো প্রশ্ন আসে না। অথচ মানুষ নিজে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু না সময় ব্যয় করে তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে।'

'তুমি রাবিদের মতো কথা বলছ, রাফিদ! কেউ তোমাদের সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিতে বলেনি।'

'কোনো কিছু পরিবর্তনের জন্য কেউ কাউকে কখনো দায়িত্ব দেয় না, বাবা। দেশের উন্নয়ন, সমাজ পরিবর্তন, মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য যারা প্রতিনিয়ত কাজ করেছেন কিংবা করে যাচ্ছেন, তারা কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত না। দায়িত্বটা তাদের ভেতর থেকে এসেছে, হৃদয়ের প্রকোষ্ঠ থেকে এসেছে।'

'মানুষের ভেতরটা আমার দেখা আছে, রাফিদ। সবারই ভেতরে এক—জঞ্জাল, বাহিরটা আরেক-সাজানো। সেটা বোঝার এখনো সময় হয়নি তোমার।' ধমকের স্বরে বলেন বাবা।

'আপনার ভেতর-বাহির?'

রূঢ় হয়ে যায় বাবার চেহারাটা, হঠাৎ। আমার দিকে একপলক তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে বলেন, 'আমারটাও।' চলে যেতে নেন বাবা। ঘুরে দাঁড়ান আবার। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, 'আমি চাই তুমি খুব তাড়াতাড়ি বড় হও। জীবনকে যাপন করো। দেখবে, জীবনের বাঁকে বাঁকে কত কিছুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে তোমাকে।'

'আপনি এটা নিশ্চিত থাকতে পারেন, সেসবের সম্মুখীন হতে গিয়ে আমি কখনো পালাব না—জীবনের কোনো কিছু থেকেই পালাব না।'

বাবা আবার আমার দিকে গভীর চোখে তাকান। হয়তো পরীক্ষা করেন আমাকে, আমার ভেতরটা দেখার চেষ্টা করেন, মেলাতে চান ভেতর এবং বাহিরটা। কিন্তু কেমন যেন হতাশ দেখায় তাকে। শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন তিনি। তারপর চলে যেতে যেতে বলেন, 'যাও, ছাদে গিয়ে একবার দেখে আসো।'

দৃশ্যটা দেখে চমকে ওঠার কথা, কিন্তু চমকালাম না আমি। জানতাম, এ রকম একদিন হবেই। আজ তাই হয়েছে। ছাদে হাঁটছেন মা, মাথা নিচু করে—স্রেফ ব্লাউজ আর ছায়া পরনে তার। মেঘে আধ-ডোবা চাঁদের আলোয় অশরীরীর মতো লাগছে তাকে।

খুক করে একটু কাশি দিলাম আমি। তাকালেন না মা, আগের মতোই হাঁটতে লাগলেন তিনি। আমি আবার একটা কাশি দিলাম, মা'র এবারও মনোযোগী ছাদ ভ্রমণ। কিছুটা নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। হাঁটতে লাগলাম পাশ ঘেঁষে, মা একটু ফিরেও তাকালেন না আমার দিকে।

মা'র পাশ ঘেঁষেই হাঁটতে লাগলাম আমি। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিসফিস করার মতো বললাম, 'মা, ঘুম পাচ্ছে না আপনার?'

জবাবটা দ্রুতই দিলেন মা, 'না।' কিছুটা রাগী মনে হলো গলার স্বরটা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলাম, এমন কোনো কথা বলা যাবে না বা করা যাবে না, যাতে রেগে ওঠেন মা। রেগে গেলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, মুহূর্তেই।

মা'র প্রথম রাগ দেখেছি আমি ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়। বড় আপু কী একটা কাজে বাইরে ছিল অনেকক্ষণ। বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। রেগে যায় আপু, গটগট করে চলে যায় ওর রুমে,

জবাব দেয় না মা'র প্রশ্নের। ধুম ধরে দাঁড়িয়ে থেকে মা আপুর চলে যাওয়া দেখেন, তারপর হঠাৎ, শোকেস থেকে প্রায় সব কাচের জিনিস একটা একটা করে ভাঙতে থাকেন মেঝেতে। কেউ থামাতে পারে না মাকে। আপু দৌড়ে এসে মা'র পা জাপটে ধরে, বাবা হাত টেনে ধরেন, কোনোভাবেই থামানো যায় না মাকে। ভাইয়া হঠাৎ বাইরে থেকে বাসায় ঢোকে। মা'র কাণ্ড দেখে দৌড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তার। লক্ষ্মী মেয়ের মতো থেমে যান মা। ভাইয়া কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করে না মাকে। কেবল হাত ধরে মাকে বাথরুমে নিয়ে যায়, নিজ হাতে হাত-পা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে নিজেই মুছে দেয়। ড্রয়ার থেকে প্রেশারের একটা ওষুধ আর এক গ্লাস পানি মা'র হাতে দিতেই সুবোধ বালিকার মতো ওষুধটা খেয়ে নেন মা। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মা'র মাথায় হাত বুলাতে থাকে ভাইয়া, একটু পর ঘুমিয়ে পড়েন মা চুপচাপ।

দ্বিতীয় রাগ দেখেছিলাম ছোট খালার বিয়ের দিন। অতিথিদের সবার খাওয়া হয়ে গেছে। শেষের দিকে, খেতে বসেছে বাসার সবাই, মা-ও। বাবুর্চি রোস্ট দিচ্ছেন। মা'র কাছে আসতেই মা বললেন রোস্টের লেগ পরশনটা দিতে। বাবুর্চি বললেন, নেই, বুকের পরশনটা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন মা, বাবুর্চির হাত থেকে রোস্টের বড় থালাটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন সামনে। সবাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুড়ে ফেলে দিলেন পোলাও ভর্তি নিজের থালাটাও।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল মা'র তৃতীয় রাগটা। মা একদিন পর্দা কিনে এনেছেন বাসায়। খুব একটা বেশি সুন্দর ছিল না পর্দাগুলো। বাবা বললেন, অপূর্ব। কিন্তু বাবার কথায় এক ধরনের বিদ্রূপ মেশানো ছিল। মা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ পর আমরা টের পাই, ধোঁয়ায় ভরে গেছে আমাদের পুরো ফ্ল্যাট। রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া আসছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি, গ্যাসের চুলোর ওপর ধরে পর্দাগুলো পোড়াচ্ছেন মা। আর একটু হলে মা'র পরনের শাড়িতেও আগুন লেগে যেত, রান্নাঘরের তাকে রাখা পুরনো পেপারগুলোতে লেগে যেতে পারত। আর ওখানে লাগলে সারা ফ্ল্যাট পুড়ে ছাই হয়ে যেতে সময় লাগত মাত্র কয়েক মুহূর্ত!

মা'র রাগগুলো মনে আছে আমার। তাই সাবধান হতে হবে আমাকে। আমার কোনো কথায় রেগে গেলে মা হয়তো ছাদ থেকে লাফও দিয়ে দিতে

পারেন। আর এই ছয়তলা থেকে লাফ দিলে...না, খুব সচেতন হয়ে কথা বলতে হবে মা'র সঙ্গে।

বেশ ধৈর্য নিয়ে মা হাঁটছেন, পাশে পাশে আমিও। আধ-ডোবা চাঁদটার অনেকখানি বের হয়ে এসেছে। মা'র দিকে তাকাতে পারছি না আমি, ছায়া দেখছি তার। হঠাৎ ভাইয়ার কথা মনে হলো। ভাইয়া হলে এ মুহূর্তে কী করত? মার সঙ্গে কীভাবে কথা বলত?

আরো কয়েকবার হাঁটলাম মা'র পাশ ঘেঁষে। তারপর সুযোগ বুঝে বললাম, 'আকাশে কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, দেখেছেন মা?'

'দেখেছি।' মা'র ছোট্ট উত্তর।

'সুন্দর, না?'

'ওর জন্যই তো ছাদে এসেছি। কিন্তু পাজিটা শুধু মেঘের নিচে পালিয়ে যায়। বিরক্ত লাগে।'

'এখন তো বের হয়ে এসেছে।'

মাথা উঁচু করলেন না। চাঁদের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'চাঁদকে দেখলেই না আমার একটা গান গাইতে ইচ্ছে করে।'

'ইচ্ছে হলে অবশ্যই গাবেন। ইচ্ছে দমিয়ে রাখা ঠিক না।'

'ঠিক আছে গানটা তাহলে গাই। ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা, এই মাধবী রাত, আসেনি কভু যে আর, জীবনে আমার—।' মা পায়চারি বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। মাথা একটু কাত করে আমার দিকে তাকান। কিছুটা শ্লেষ মেশানো গলায় বলেন, 'আমার না এখন নাচতে ইচ্ছে করছে।'

কিছু বলি না আমি।

মা কিছুটা শব্দ করে বলেন, 'কী বললাম, শুনিসনি?'

অস্ফুটস্বরে আমি বলি, 'জি।'

'কি, নাচব?'

'খুব নাচতে ইচ্ছে করছে?'

'খু-উ-উ-উ-ব।' প্রলম্বিত স্বরে বলেন মা।

'খুব ইচ্ছে করলে তো কোনো কথা নেই, মা।'

মা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠার মতো ভঙ্গি করেন। সরাসরি তাকাতে পারি না আমি তার দিকে, তার ছায়ার দিকেও না। নিঃশব্দ রাত, ধুবধুব শব্দ হচ্ছে ছাদে, মা'র পায়ের আঘাতে। আড়চোখে, আতঙ্কিত মনে, আশপাশের বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকাই। বারবার তাকাই। না, কেউ জেগে নেই এখন।

কেবল লোটনদের পানির ট্যাংকির নিচে যে পেঁচা দুটো বাসা করেছে, ট্যাংকি থেকে যে লোহার একটা রড বের হয়ে আছে, সেখানে বসে, মুগ্ধ চোখে মাকে দেখছে ওরা। স্থির চোখে, স্থির বসে।

হাঁপাতে হাঁপাতে নাচ শেষ করলেন মা। একটা হাত বাড়িয়ে দেন আমার দিকে। আমি হাতটা ধরে কিছুটা জড়িয়ে ধরি তাকে। আমার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। শেষে ফোঁত করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'রাফিদ?'

'জি। জি মা।' মা'র কাতর স্বরে বুকটা মুচড়ে ওঠে আমার।

'সেই গোপন কথাটা বলব তোকে। শুনবি?'

ঝট করে মনে পড়ল, মা'র কোনো কথাতেই না করা যাবে না এখন। কিন্তু মা কী বলবেন তা তো আমি জানি। বাবা যে সপ্তাহে এক দিন বাসায় মেয়ে নিয়ে আসেন, মা মনে করেন, সেটা আমি জানি না। মা অনেক দিন সেই 'গোপন' কথাটা বলতে চেয়েছেন, প্রতিবারই কৌশলে এড়িয়ে গেছি আমি। এ রকম গোপন কথা, সেটা আবার নিজের বাবার, শোনাটা কেমন ইয়ে মনে হয় না, কেমন সংকোচ লাগে না!

মা'র একটা হাত চেপে ধরি আমি। শিশুর মতো খুব আদুরে গলায় বলি, 'ছোটকালে আমি যখন ঘুমাতাম, তখন একটা ভূতের গল্প বলতেন আপনি। গল্পটা মনে আছে মা, আপনার?'

'কোন গল্পটা যেন?' মা'র আগ্রহী গলা।

গল্পটা আমারও মনে নেই। কিন্তু মাকে হতাশ করা যাবে না। দ্রুত একটা গল্প বানিয়ে ফেললাম, 'ওই যে একটা ভূত প্রতিদিন এক কৃষকের পুকুরের মাছ চুরি করে নিয়ে যেত। একদিন চুরি করতে গিয়ে—।'

মা আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে কী যেন মনে করতে থাকেন। একটু বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওই যে পাজি ভূতটা—।' মা আবার থেমে যান। কিছু মনে করতে পারেন না আর। মনে করতে পারার কথাও না। কারণ ওই গল্প মা কখনো বলতেন না আমাকে। এটা তো আমার গল্প, আমার বানানো গল্প।

ছাদের ওপর পা মেলে বসে পড়েন মা। পাশে আমিও। আমার মাথায় হাত বুলাতে থাকেন তিনি। মা'র চোখে পানি। আমার চোখেও। কত দিন পর মা এভাবে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন আমার। মাথা থেকে হাতটা মুখে এসে থেমে যায়। শব্দ করে কেঁদে ওঠেন মা, 'রাফিদ, বাপ আমার, আমি কি

পাগল হয়ে গেছি, বাপ? তোরা কি আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবি? তারপর একদিন কোনো পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিবি?' মা আমাকে খামচে ধরেন, 'ওই কাজটি কখনো করিস না, বাপ। তোদের ছাড়া ওখানে একা একা থাকতে পারব না আমি। আমি আরো পাগল হয়ে যাব রে!'
চোখ ফেটে যাচ্ছে আমার। মা উঠে দাঁড়ান। আমিও। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে মা বলেন, 'ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু এই ছাদ থেকে নিচে যেতে পারব না, পরে যাব আমি। আমাকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে।' মা হঠাৎ আমার গলা জাপটে ধরেন। শিশুরা যেমন কোলে ওঠার জন্য গলা জাপটে ধরে, ঠিক সেইভাবে।

মা'র মুখের দিকে তাকাই আমি। মেঘের আড়াল থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে এসেছে চাঁদটা। আমার গলা জাপটে ধরে আছে যে, সে আর এখন আমার মা না, আমার মেয়ে। ছোট্ট মেয়ের মতো ঠিক কোলে না, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে নিচে নামতে থাকি মাকে নিয়ে। নামতে নামতে সিদ্ধান্তটার কথা আবার মনে করি—খুনটা করতেই হবে, যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে।

ঘুম আসছে না মোটেই। মাকে ঘুম পাড়িয়ে সেই যে কখন নিজের ঘরে এসেছি, ঘুম আসছে না তবুও। ভোরের আজান দিচ্ছে অনেক মসজিদে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, একটু একটু করে আলো ফুটে ওঠার আভাস দেখছি। ফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। আমি নিশ্চিত, রাজন্যার ফোন। কিন্তু ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম, না, ওটা প্রাচীর।

'প্রথমেই সরি, ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি। এই তো কিছুক্ষণ আগে। দেখার পরপরই ঘুমটা ভেঙে গেল।' প্রাচীর উৎফুল্ল গলা, 'কি স্বপ্ন দেখেছি, বলব?'

'এটা কি স্বপ্ন বর্ণনা করার সময়!'

'স্বপ্ন বর্ণনা করার নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে নাকি!'

'ঠিক তা নেই। তবে এই সকালবেলায়—।'

থামিয়ে দিল প্রাচী আমাকে, 'ঠিক আছে, অন্য কথা বলি আমরা। অন্য কথা বলা যাবে তো?' হাসতে থাকে প্রাচী, 'আপনি কে সেটা তো আমি জানি। কিন্তু আমি কে—কথাটা এখান থেকে শুরু করা যেতে পারে। পারে না?'

'পারে।' ছোট্ট করে উত্তর দেই আমি।

'আচ্ছা, একটা পুরুষ কোন স্বপ্নটা সব সময় দেখে? জানেন এটা?'

'না।'

'ঝট করে না বললেন! একটু ভাবুন। ভেবে তারপর বলুন।'

'আমি সত্যি জানি না।'

প্রাচী কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলে, 'সফল হওয়ার স্বপ্ন।'

'আমার মনে হয় না।'

'ইয়েস, আপনার মনে না হওয়ারই কথা। কারণ আপনার সফল হওয়ার বয়সের আগেই আপনি সফল। সফলতার মূল কথাটা কি জানেন তো? যা ইচ্ছে তাই করতে পারা।'

'আমি কি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি?'

'আপনার বয়সী অনেক ছেলে যা করতে পারে না, আপনি তা পারেন। পৃথিবীতে খুব কম মানুষ আছে, যারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।' প্রাচী একটু থেমে বলে, 'এবার বলুন তো, অধিকাংশ মেয়ে কোন স্বপ্নটা সব সময় দেখে?

'না, এটাও পারব না।'

'একটু ভাবুন।'

'না, ভেবেও বলতে পারব না।'

'একটা মেয়ে সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখে একটা সংসারের। খুব ছিমছাম একটা সংসার, খুব নিজস্ব একটা সংসার। ভালো কথা—।' খিলখিল করে হেসে ওঠে প্রাচী, 'রাজন্যা দেখতে কেমন?'

ঝট করে ভেবে নেই আমি। রাজন্যাকে চেনার কথা না প্রাচীর। কীভাবে ও নাম জানল ওর! ব্যাপারটা ঝালাই করা দরকার। সুতরাং প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ওনাকেই প্রশ্ন করলাম, 'রাজন্যা কে?'

আগের চেয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে প্রাচী, 'রাজন্যা হচ্ছে রাজকন্যা, সাত সমুদ্র তের নদী পারের রাজকন্যা। যার জন্য নির্ঘুম কাটানো যায় হাজার রাত। যাকে ভেবে কবিতা লেখা যায় লক্ষ-কোটি। আচ্ছা—।' প্রাচী একটু থেমে বলেন, 'রাজন্যার চোখ দুটো কি টানা টানা? মণি দুটো কালো রঙের?'

বনানী থানার সেকেন্ড অফিসার মুশফিকুর রহমান আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারটা একটু সরিয়ে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। হাসি হাসি মুখে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আরে সাহেব, জীবনে অনেক ঝামেলায় পড়েছি, কঠিন কঠিন ঝামেলায় পড়েছি। কিন্তু আপনি যে ঝামেলায় ফেলে দিয়ে গেছেন সেদিন, সেই রকম ঝামেলায় পড়িনি কখনো!'

'বুঝলাম না আপনার কথা।' বিব্রত হয়ে বলি আমি।

'ঝামেলায় ফেলে দিয়ে এখন বলছেন বুঝলাম না! ওই যে কী একটা ধাঁধা বলে গেলেন না! মাথা তো আওলা হয়ে গেছে আমার।'

'সরি।'

'না না সরি হওয়ার কিছু নাই। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। যতক্ষণ না উত্তরটা বের করতে পারছি ততক্ষণ ছাড়ছি না। আগে এগারোটার সময় ঘুমাতাম, এখন এক ঘণ্টা পরে ঘুমাই। এই এক ঘণ্টা ওই ধাঁধার উত্তর বের করার চেষ্টা করি। চোর-ছেঁচড় নিয়ে কারবার, সারাদিন তো আর সময় পাই না। দেখি শেষ পর্যন্ত কী করতে পারি।'

'আমি আবারও সরি।'

'বারবার সরি হচ্ছেন কেন! বউ বিরক্ত ছিল প্রথমে, লাইট জ্বালিয়ে চিন্তা করি তো। কাল রাতে দেখি কী জানেন, বউ আমার পাশে বসে আমার মতোই চিন্তা করছে। আমার তো মনে হয়, আমার চেয়ে এখন ধাঁধা নিয়ে ও-ই বেশি চিন্তিত। আপনাকে যে মোবাইল করব, সেটাও তো সম্ভব হয় নাই। আপনার কাছে নাম্বার চেয়েছিলাম, কিন্তু কথা বলতে বলতে নাম্বারটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ভালো কথা, চা খাবেন তো?'

'জি, খাব।'

'আপনাকে আজ দুধ চা খাওয়াব। থানার সামনে নতুন একটা চায়ের দোকান হয়েছে, খুব ভালো দুধ চা বানায় ছেলেটা।' সেকেন্ড অফিসার

সাহেব দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জয়নাল, আছ নাকি ওখানে?'

জবাব দিল না জয়নাল, অন্য কেউও দিল না। মুশফিকুর রহমান সাহেব মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'থানায় ঠিকমতো কাউরে পাওয়া যায় না। সবাই এত ব্যস্ত! আচ্ছা—।' মুশফিকুর রহমান সাহেব আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন, 'আপনার নামটা কিন্তু জানা হয় নাই!'

'রাফিদ।' সোজা হয়ে বসলাম আমি।

'কিছু মনে করবেন না। মাথাটা একটু উঁচু করুন তো।'

মাথা উঁচু করলাম আমি। মুশফিকুর রহমান সাহেব আমার চোখের দিকে তাকালেন। কিন্তু তিনি এমনভাবে দেখতে লাগলেন, যেন সোনার কোনো খনি দেখতে পাচ্ছেন আমার চোখের ভেতর। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি শব্দ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আপনার চোখ দুটো এত লাল কেন বলুন তো?'

'রাতে ভালো ঘুম হয়নি।'

'না না, ঘুম অনেকেরই হয় না। কিন্তু তাদের চোখ কিন্তু এত লাল দেখায় না। আমার মনে হয় ডাক্তার দেখানো উচিত আপনার। আগে চোখের ডাক্তার দেখালে ভালো হয়। ভালো কোনো ডাক্তারের সঙ্গে জানাশোনা আছে আপনার? না থাকলে আমাকে বলবেন।'

'ঠিক আছে, বলব।'

'সত্যি কথা বলতে কি, চোখ লাল হওয়ার কারণে আপনার চেহারায় একটা খুনি খুনি ভাব এসেছে। হা হা হা, মাইন্ড করলেন নাকি?'

'না।'

'একটু মজা করলাম আর কি। সবাই মনে করে চোর-ডাকাতদের নিয়ে কারবার বলে পুলিশ কখনো হাসতে জানে না, মজা করতে পারে না। অথচ আমাদের অনেক মজার পুলিশ আছে। একবার হয়েছি কি জানেন—।'

খুক করে একটু কাশি দেই আমি। থেমে যান মুশফিকুর সাহেব। প্রসঙ্গটা পাল্টানো দরকার, 'আমি কি ধাঁধার উত্তরটা বলে দেব আপনাকে?'

'আলবত না। এ কয়দিন যখন চেষ্টা করতে পেরেছি, আরো কয়েক দিন পারব ইনশাআল্লাহ। শেষ পর্যন্ত না পারলে তখন দেখা যাবে। ভালো কথা, চা না হলে এখন আর চলছে না।' মুশফিকুর রহমান সাহেব আবার দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জয়নাল?'

না, এবারও কেউ জবাব দিল না।

'ইয়ে—।' মুশফিক সাহেবের দিকে এবার আমিই ঝুঁকে বসলাম, 'একটা কাজে এসেছিলাম আপনার কাছে।'

'মানুষ তো থানায় কাজেই আসে। আড্ডা দেওয়ার জায়গা না তো এটা। আর পুলিশের এত সময়ইবা কোথায় যে বকবক করবে, আড্ডা দেবে! আপনার কাজের কথা অবশ্যই শুনব, তার আগে চাটা না খাওয়াতে পারলে তো ভালো লাগবে না আমার।'

'চা পরে হলেও চলবে।'

'তবু অতিথি বলে কথা। আপনার বাসায় গেলে আপনি কি চা না খাইয়ে আসতে দেবেন আমাকে? জয়নাল-।' মুশফিকুর রহমান সাহেব নিজেই উঠে দাঁড়ালেন এবার। বাইরে গিয়ে একটু পর আবার ফিরে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'থানা তো আজকে গরম। সাবেক এক এমপির বউ পালিয়ে গেছে বর্তমান এমপির হাত ধরে। বড় সাহেবের রুমের সামনে দেখলাম প্রচণ্ড ভিড়। সেদিন এক মন্ত্র রাজনীতিবিদ এসেছিলেন থানায়। কাজের মেয়েকে কী যেন করেছেন, সেটা আবার জেনে গেছে এক মানবাধিকার সংস্থার লোকজন। মহাকেলেঙ্কারি!' চেয়ারে বসে তৃপ্তির একটা শব্দ করে বললেন, 'চা এসে যাবে এখনই। তার পরই আপনার কাজের কথা শুনব।'

চা এসে গেছে। মুখে দিয়েই ছ্যাঁত করে উঠলেন মুশফিকুর রহমান সাহেব, 'শালারা চায়ে যা চিনি দেয়! সব ডাইলখোরের কারবার। আপনি জানেন তো, যারা ফেন্সিডিল খায়, চায়ে তারা চিনি একটু বেশি খায়। নিন, চা নিন।'

কাপটা হাতে নিলাম আমি। কিন্তু ঠোঁটে ঠেকালাম না। কাপের কোনায় কনডেন্স মিল্ক লেগে আছে। কনডেন্স মিল্ক দেখলেই গা কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে আমার।

'নিন নিন, চুমুক দিন।' মুশফিকুর রহমান সাহেব শব্দ করে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মিষ্টি বেশি হলেও চাটা স্বাদের হয়েছে। আপনি বরং চা খেতেই খেতেই কাজের কথাটা বলুন।'

'দুই দিন আগে একটা ছেলেকে ধরে আনা হয়েছে থানায়।'

'কী নাম?'

'রাবিদ আসিফ।'

মুশফিকুর রহমান সাহেব একটু ভেবে বললেন, 'ওই আসিফুজ্জামান চৌধুরীর ছেলে?'

'জি।

'উনি তো এখন থানায় নেই।'

'কোথায় আছে এখন?'

'সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই, আপনি আসার ঘণ্টা দেড়েক আগে।'

'কে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে?'

'সেটা তো বলতে পারব না। বড় সাহেব ছেড়ে দিতে বলেছেন, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' মুশফিকুর রহমান সাহেব গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস করে বললেন, 'বহুত ড্যাঞ্জারাস ছেলে। ওর একটা ঘটনা বলি—।'

হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দেই আমি মুশফিক সাহেবকে। উঠে দাঁড়াই আমি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, 'উঠছেন কেন আপনি! খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। তাছাড়া চায়ে তো একটা চুমুকও দিলেন না আপনি!'

'খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

'ঘটনাটা শুনে যান।'

'ওটাও শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে, আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান। ধাঁধার উত্তরটা বের করতে পারলেই আপনাকে ফোনে জানাব।'

কাগজে ফোন নাম্বারটা লিখে দিলাম আমি। মুশফিক সাহেব সেটা হাতে নিয়ে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে—রাবিদ সাহেব আপনার কে হন?'

রুম থেকে বের হতে হতে আমি বলি, 'কেউ না।'

ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিলাম আমি। থানা থেকে বের হয়েই অন করলাম। মিসড কল এলার্টে চারটা নাম্বার শো করছে। তিনটা অপরিচিত, একটা রাজন্যার। প্রথম নাম্বারটায় কল ব্যাক করলাম। খুব ভদ্র গলায় একজন বললেন, 'আপনি কি রাফিদ সাহেব বলছেন?'

অপরিচিত কণ্ঠ। দ্বিধা নিয়ে বললাম, 'জি।'

'আপনি এখন কোথায় আছেন?'

'বনানী থানার পাশে।'

'আপনি ওই জায়গাতেই থাকুন, ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দিলেন লোকটি। কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না। দাঁড়িয়ে রয়েছি, সিদ্ধান্তহীনতায়। চার মিনিটের মাথায় লোকটি হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভোজবাজির মতো হাজির

হলেন আমার সামনে। আগের মতোই ভদ্র গলায় বললেন, 'যদি ভুল না হয় আমার, আপনি রাফিদ সাহেব।'

লোকটার দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। তবু মনে করার চেষ্টা করলাম। না, সত্যি দেখিনি। একেবারেই লিকলিকে একটা শরীর, চোয়াল ভাঙা, চোখ দুটোও কেমন গর্তের ভেতর। তবে ঠাণ্ডা, শান্ত, স্থির।

'রাফিদ সাহেব তো আপনি?'

আগের মতোই দ্বিধা নিয়ে বললাম, 'জি। কিন্তু—।' কথা শেষ করতে দিলেন না লোকটি। স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'খবর পেয়েছি, আপনার একটা মানুষ দরকার।'

লোকটার দিকে তাকিয়েই ছিলাম আমি। হঠাৎ গভীর দৃষ্টিতে তাকালাম। একটা মানুষ দরকার আমার, ঠিক, কিন্তু এই মানুষটা! লিকলিকে একটা মানুষ! একেবারেই মাংসবিহীন শরীর!

'পছন্দ হয়নি আমাকে, না?' মিষ্টি করে হাসলেন লোকটি। অবাক হয়ে গেলাম আমি। একজন খুনি কখনো এভাবে মিষ্টি করে হাসতে পারে না। খুনির হাসি কখনো এত পবিত্র হয় না!

বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে নাক ঘষতে ঘষতে লোকটি বললেন, 'ওকে, আসি। সময় নষ্ট করলাম আপনার।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল লোকটি। হাত দিয়ে ইশারা করলাম তাকে। থেমে গেলেন তিনি। একটু এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। ইতস্তত ভঙ্গিতে বললাম, 'এ রকম কাজ আগে কখনো করেছেন?'

চোখ দুটো সরু করলেন লোকটি, 'আমার মতো একজন মানুষের সঙ্গে আপনার কথা হবে সীমাবদ্ধ—কাজ করব, কাজ শেষে পেমেন্ট নেব। মাঝখানে আর কোনো কথা না বলাই ভালো। কোনো প্রশ্ন তো নয়ই। আসি।' দু'পা এগিয়েই লোকটি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে, 'স্টুয়ার্ট গোমেজকে চেনেন আপনি?'

'না।'

'আমেরিকার একজন প্রফেশনাল খুনি। তার ওজন কত ছিল জানেন? মাত্র বায়ান্ন কেজি। বয়স চৌত্রিশ। মোটা কাচের চশমা পরতেন। প্রথম দর্শনেই তাকে দেখে অনেকে মনে করতেন, কোনো মেডিকেলের ছাত্র তিনি। কিন্তু যেদিন তিনি ধরা পড়েন, সেদিন সকালে খুন করেছিলেন একটা। মোট কতগুলো খুন করেছিলেন, জানেন?'

মাথা এদিক-ওদিক করি আমি। লোকটি হাসতে হাসতে বলেন, 'একচল্লিশটা।' অবজ্ঞার একটা চাহনি দিয়ে লোকটি চলে যান তারপর।

বেশ কিছুক্ষণ একা একা হাঁটি আমি। গাড়ি নেইনি আজও। কিছুদূর যাওয়ার পর ফোনটা বেজে ওঠে। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে খুব বিনীত গলায় একজন সালাম দিয়ে বলেন, 'মুগদাপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক মাহতাব উদ্দিন বলছিলাম। কিছুক্ষণ আগে ফোন দিয়েছিলাম আপনাকে, বন্ধ ছিল ফোন। চিনতে পেরেছেন আমাকে?'

'জি, চিনতে পেরেছি। কেমন আছেন আপনি?'

'আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু খুব শরমিন্দার মধ্যে আছি, বাবাজি।'

'কেন?'

'ঋণী হয়ে আছি না। টাকাটা দ্রুত ফেরত দেওয়া দরকার। একটু অসুবিধার মধ্যে অবশ্য আছি।'

'এত দ্রুত ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। আপনি আপনার সুবিধামতো টাকাটা দেবেন। কোনো সমস্যা নেই।'

'কিন্তু আমি তো সমস্যা অনুভব করছি। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক টাকাটা দিতে পারলাম না। কেমন শরমের কথা না!'

'না, এটা কোনো শরমের ব্যাপার না। আপনি বরং আপনার ছেলের কথা বলুন। কেমন আছেন তিনি এখন?'

মাহতাব উদ্দিন সাহেব গলাটা খাদে নামিয়ে বললেন, 'আল্লাহ যে হালে রাখেন, সেটাতেই শুকুর। ছেলেটার জন্য প্রতিদিন দোয়া করি আমি। প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে ওর জন্য কাঁদি। বলি, হে আল্লাহপাক, জ্ঞানত আমি কোনো পাপ করি নাই; কোনো নামাজ কামাই করা তো দূরের কথা, ক্বাজা করি নাই; তুমি আমাকে এ রকম শাস্তি দিচ্ছ কেন, খোদা?'

'নিশ্চয় আল্লাহ আপনার কথার জবাব দেবেন।'

'আমি সেই অপেক্ষাতেই আছি।'

'এখন রাখি।'

'সরি ফর ডিস্টার্বিং ইউ। নতুন একটা ধাঁধা শুনবেন আপনি? খুব সহজ ধাঁধা। কিন্তু সবাই মনে করে কত কঠিন! এবারের ধাঁধাটা বাংলায় বলব—

লোহার চেয়ে শক্ত
তুলোর চেয়ে নরম
অপরাধ করলে সে
বড্ড পায় শরম!

বলুন তো কী?'

'পারব না।'

'ইদানীং সবাই চট করে বলে দেয়, পারব না। একটু ভাবা দরকার। ভাবলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তা যত কঠিন প্রশ্নই হোক।'

'ধাঁধাটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে।'

'মোটেই কঠিন না, খুব সহজ! একটু ভাবুন, একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবুন, তারপর বলুন।'

'না, পারব না।'

মুগদাপাড়া প্রাইমারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক মাহতাব উদ্দিন সাহেব খুব আন্তরিকতার স্বরে বললেন, 'মন, মানুষের মন।'

বাসায় আজ মেয়ে নিয়ে আসবেন বাবা। বৃহস্পতিবার। ফুটোতে চোখ রাখব আমি। মা'র ঘরের ফুটোতেও, বাবার ঘরেরও। দুজনকেই আজ দেখব, যথারীতি। প্রয়োজনীয় সব কাজ সেরে ফেলেছি। অপেক্ষা করছি এখন। ঘড়ির দিকে তাকালাম। বারোটা পেরিয়ে কয়েক মিনিট। ঢাকা শহরে রাত খুব বেশি না। দেড়টার মধ্যেই এসে পড়বেন বাবা। প্রতি বৃহস্পতিবার যেমন আসেন।

সাড়ে বারোটার দিকে বাসার দারোয়ান গনি মণ্ডল আমার ঘরে এসে কাতর গলায় বললেন, 'স্যার, দুটো সমস্যায় পড়েছি। দুটোই খুব প্রকট। বুঝতে পারছি না আমি এখন কী করব!'

গনি মণ্ডলের বাড়ি কুষ্টিয়া। সাত-আট বছর আমাদের বাসায় আছেন। খুব শুদ্ধ করে কথা বলেন এখনো, কুষ্টিয়ার ভাষাতেই। তবে সমস্যা দ্বারা সব সময় আক্রান্ত থাকেন তিনি, একেবারে সমস্যাজর্জরিত। সব কিছুতেই সমস্যা খুঁজে পাওয়া তার একটা কমন স্বভাব। বছর তিনেক আগে হঠাৎ মাকে এসে বলেন, 'ম্যাডাম, স্যার তো ফকির হয়ে যাবেন।'

বাবার সঙ্গে তেমন কথা বলার সাহস পান না গনি মণ্ডল, যা বলার মাকেই বলেন। সব কথা তার মা'র সঙ্গে। কথাটা শুনে মা গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার স্যার তো ফকিরই, গনি মণ্ডল।'

'এটা আপনি কি বললেন, ম্যাডাম!'

'ফকিররা কী করে? সকালে ঘুম থেকে উঠেই টাকা রোজগারের জন্য ঘর থেকে বের হয়, ফেরেও অনেক রাতে। তোমার স্যারও তো তাই করে। ঘুম থেকে উঠেই অফিস-কারখানা, ফিরতে ফিরতেও রাত একটা-দেড়টা।'

'আমি আসলে অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

গুরুত্বহীন স্বরে মা বলেন, 'বলো।'

'আজ সকাল থেকে খেয়াল করি আমাদের পানির পাইপ দিয়ে প্রচুর পানি যাচ্ছে ড্রেনে।'

'পানি বেশি ইউজ হলে তো যাবেই। আমাদের ছয়তলা বিল্ডিংয়ের তিন

থেকে ছয় তলা পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া। ভাড়াটেরা আছে না! ওরা পানি ব্যবহার করে না?'

'কিন্তু আমাদের আশপাশের বিল্ডিংগুলোর পাইপ থেকে তো তেমন পানি পড়ে না। এটা কিন্তু খুব মারাত্মক একটা সমস্যা, ম্যাডাম। এভাবে পানি খরচ হলে স্যার কিন্তু সত্যি সত্যি ফকির হয়ে যাবেন।'

মা হাসতে হাসতে বলেন, 'সমস্যা আর বেশি দিন থাকবে না। এটা ভেঙে আরো বড় একটা বিল্ডিং করবেন তোমার স্যার। শুধু অফিস হবে এখানে। আমরা নতুন বাসায় চলে যাচ্ছি কয়দিন পরেই। তোমার স্যার নতুন একটা বাড়ি করছেন না! ডুপ্লেক্স বাসায় তো ভাড়াটেদের সমস্যা থাকে না। তোমার স্যারেরও ফকির হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

এরকম ডজন ডজন সমস্যায় প্রতিদিন জর্জরিত থাকেন গনি মণ্ডল। বাসার সামনে কুকুর এসে বসে থাকে কেন, ফকির এসে কলিং বেল টেপে কেন, হকার সুন্দরভাবে ভাঁজ করে পেপার দেয় না কেন, ভাড়াটেরা পা ঘষে ঘষে সিঁড়িতে হাঁটে কেন, শব্দ করে বাসার গেট খোলে কেন সবাই—পদে পদে সমস্যা তার।

ভালো করে গনি মণ্ডলের দিকে তাকালাম আমি। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ানো তিনি। কাতর চেহারায় তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। ইশারা করে কাছে আসতে বললাম তাকে। দু'পা এগিয়ে এসে থেমে গেলেন তিনি। খুব শান্ত গলায় তাকে বললাম, 'সমস্যা দুটো বলুন।'

দু'হাত কচলাতে কচলাতে গনি মণ্ডল বললেন, 'খবর এসেছে, আমার শাশুড়ির প্রায় যায় যায় অবস্থা।'

'এর আগেও তো এ রকম হয়েছিল। একবার না, সম্ভবত দু'বার হয়েছিল।'

'জি। এবার দিয়ে তিনবার। এবার হয়তো টিকবে না। শুনেছি, মানুষ দুবার দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে পারে, তিনবার হলে পারে না।'

'তা কি করতে হবে এখন?'

'আমার যে এখনই একবার যাওয়া দরকার। খুবই সিরিয়াস কারবার। আমার ওয়াইফ তো কান্নাকাটি করে অস্থির। আমাকে এখনই যেতে বলেছে। তার কথা শুনে মনে হলো, কুষ্টিয়া খুব একটা বেশি দূরে না। গাড়ি-ঘোড়া না পেলে দৌড়েই চলে যাওয়া যাবে।'

'আপনি এখন কুষ্টিয়া যেতে চাচ্ছেন?'

'আপনার অনুমতি পেলে।'

'এত রাত করে গাড়ি পাবেন?'

'জি, সারারাতই বাস পাওয়া যায়। খালি বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছানো দরকার। অবশ্য কাল সকালে গেলেও চলবে। কিন্তু এরই মধ্যে যদি কিছু একটা হয়ে যায়, সারাজীবন অপরাধী হয়ে থাকা লাগবে মানুষটার কাছে।'

লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন গনি মণ্ডল। নতজানু মানুষ দেখা অনেকটা অস্বস্তিকর। অস্বস্তি কাটাতে আমি বললাম, 'দুটো সমস্যার কথা বলেছেন আপনি। প্রথমটা গেল, দ্বিতীয়টা?'

'দ্বিতীয়টা হচ্ছে, বড় স্যার আসতে আসতে আরো এক-দেড় ঘণ্টা লাগবে। আমি তো চলে যাব, গেট খুলে দেবে কে?'

'অসুবিধা নেই, আমি খুলে দেব।'

'আপনি খুলে দেবেন!'

'কেন, কোনো সমস্যা?'

'বড় স্যার ব্যাপারটা যে কীভাবে নেবেন!'

গনি মণ্ডলের এই কথাটা শোনার পর আমার বলা উচিত—কীভাবে নেবেন মানে! খুব সযতনে এড়িয়ে গেলাম আমি প্রসঙ্গটা। বাবা যে সপ্তাহের একদিন মেয়ে নিয়ে আসেন বাসায়, সবার ধারণা সেটা আমি জানি না। আমি কেবল বাসায় ঢুকেই নিজের রুম বন্ধ করে দেই, লেখাপড়া করি, কম্পিউটারে বসে থাকি।

'কোনো সমস্যা নেই। আপনি যান, বাবাকে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

'কিন্তু—।' থেমে যান গনি মণ্ডল। প্রচণ্ড হাসি পায় আমার। জীবন এ রকমই। কোনো না কোনো সময় মানুষকে সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। আজ আমি বাবার মুখোমুখি হবো—যে বাবা মাতাল থাকবেন, যে বাবা একটা মেয়ের হাত ধরে রাখবেন, যে বাবা...। চোখে পানি জমে উঠছে আমার। অস্থির হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতর। গরম হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। না, আর দেরি নয়, খুনটা করতেই হবে। দু-এক দিনের মধ্যেই করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে।

তিনতলার মেয়েটা সুর তুলে পড়ছে। মুগ্ধ হয়ে আমি তার পড়া শুনছি। মাঝে মাঝে থেমে যায় সে। একটু পর আবার শুরু করে, পূর্ণোদ্যমে। একটানা পড়তে থাকে কয়েক মিনিট।

চেহারাটা ভেসে ওঠে মেয়েটার। গোলগাল চেহারা, একটু মোটা ধরনের। চোখে চশমা পরায় বেশ বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী মনে হয় তাকে। কখনো কথা হয়নি তার সঙ্গে। দেখা হলে কথা বলব এবার। ছোট্ট করে

তাকে একটা প্রশ্ন করব—কী হতে চান এত লেখাপড়া করে? আমি ঝট করে উত্তর দিতে পারবে না মেয়েটা। কিছুটা বিব্রত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাবে। একটু পর নিচু করে ফেলবে মাথাটা। তাই দেখে হাসতে হাসতে আমি বলব—মানুষ যা হতে চায়, কখনোই হতে পারে না তা। শেষ পর্যন্ত সে যা হতে পারে, তা তার চাওয়ার চেয়ে কম কিংবা বেশি। কিন্তু জানেন, আমার না কোনো চাওয়া নেই। চাওয়াহীন মানুষের বেঁচে থাকা খুব কষ্টকর। জীবনটা তার কাছে নিতান্তই পানসে মনে হয়, স্বাদহীন-বর্ণহীন মনে হয় সবকিছু। প্রতিদিন তার কয়েকবার মরে যেতে ইচ্ছে করে, নিজেকে নিজের মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে! স্রেফ খুন করতে ইচ্ছে করে নিজেকে!

কান পেতে আছি আমি। বাইরের গেটে শব্দ হলেই খুলে দেব দৌড়ে গিয়ে। একটু দেরি হলে সম্ভবত বাবা রেগে যাবেন। এই মাঝরাতে বাবাকে রাগানো ঠিক হবে না। চমকে উঠে ঘুম ভেঙে যাবে অনেকের।

ঘড়ির দিকে তাকালাম, একটা বেজে দশ মিনিট। সব কিছু কেমন যেন স্থির হয়ে আছে চারপাশে। নিশ্চুপ। তারাভর্তি আকাশ। কোনো কোনোটা এত বেশি উজ্জ্বল, মনে হয়, এই তো, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে সেটা। না, হাত বাড়ালেই সব কিছু ছোঁয়া যায় না।

হাত বাড়ালেই ফুটে থাকা রক্তিম গোলাপ—
তবু যে যার কাঁটার কাছে ফিরে যায় একদিন,
একদিন যে যার নিঃসঙ্গতার কাছে।

কার কবিতা যেন এটা? হেলাল হাফিজের, না রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর? ঠিক মনে পড়ছে না। রাজন্যা বলতে পারবে এটা। হায় হায়, সারাদিন রাজন্যাকে ফোন করা হয়নি। আচ্ছা, আমি কি চেইঞ্জ হয়ে যাচ্ছি, আমার ভেতরটা? কোনো একটা ডিজ অর্ডার এসেছে শরীরে? অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি কেন আমি ইদানীং? একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি না কেন? কোনো কিছু ভাবতে পারি না কেন একটু সময় নিয়ে? কাল রাতে বাসায় ফিরে এক রিকশাওয়ালাকে বিশ টাকার পরিবর্তে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিয়েছি। রিকশাওয়ালা চুপচাপ নিয়ে গেছে সেটা। আচ্ছা, একটুও বুক কাঁপল না তার!

ফোনটা হাতে নিলাম। রাজন্যার সঙ্গে কথা বলব। দ্বিধা কাজ করছে একটু। রাত তো অনেক হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সম্ভবত। না, দুবার রিং

বাজতেই রিসিভ করল ও, 'খুব বেশি বাতিল হয়ে গেছি?'

ধক করে ওঠে বুকের ভেতরটা। ঝট করে বুঝে নেই কথা দিয়ে ভুলাতে হবে রাজকন্যাকে। বিনীত গলায় বলি, 'মাঝে মাঝে পালাতে হয়—সব ছেড়ে, সব কিছু ছেড়ে। বোঝা যায়—কে আমার প্রিয়, আমি কার প্রিয়।'

'বুঝতে পেরেছ?'

'একটু একটু। তবে সত্য কথা হচ্ছে—মানুষ সব কিছু থেকে পালাতে পারে, পারে না কেবল নিজের কাছ থেকে, নিজের আত্মার কাছ থেকে।'

'ওটাই প্রত্যাবর্তন, ওটাই শেষ গন্তব্য।'

'ওটাই ভালোবাসার সব আধার।'

'একটা কথা বলব?' বেশ দূরাগত গলায় বলে রাজন্যা।

'মাত্র একটা?' সিরিয়াস ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করি আমি।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে রাজন্যা। তারপর শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তুমি কি কোনো ডিস্টার্বেন্স ফিল করছ?'

'প্রশ্নটা তো তুমি আগেও করেছ, রাজকন্যা?'

'হ্যাঁ।' দুঃখী দুঃখী গলায় রাজন্যা বলে, 'আমি এখন যে কথাগুলো বলব, সেগুলোও আগে বলেছি আমি। আমার ভেতর যে একজন বেড়ে উঠছে, তার সব দায় আমার, আমি সব কিছুর দায়বদ্ধতা স্বীকার করছি। যে কয়জন ব্যাপারটা জানে, সেটাই শেষ জানা। আর কেউ জানবে না।'

'এবার আমি তোমাকে একটা কথা বলি—তুমি কি আমার মাঝে এমন কিছু দেখেছ, যাতে মনে হচ্ছে আমি ডিস্টার্ব?'

'মানুষের অসম্ভব একটা গুণ হচ্ছে—ভালোবাসার ব্যাপারটা যেমন সে অনুভব করতে পারে; অবহেলিত হলেও সে তেমন সেটা বুঝতে পারে।'

হেসে ফেলি আমি, দুঃখ ঢাকার হাসি। আমি এমনি এমনি হাত বাড়াই সামনে, বাতাস ধরার চেষ্টা করি, ওই বাতাসে রাজন্যাকে খুঁজি। আমি আমার ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখি, এখানে-ওখানে তাকাই, দেখার চেষ্টা করি ওকে। বাইরে তাকাই জানালা দিয়ে, দূর নক্ষত্রের মাঝে, ছায়া খুঁজি আমি ওর। কিন্তু না, কোথাও খুঁজে পাই না আমি ওকে। হঠাৎ টের পাই, ও আছে আমার বুকের মাঝে, আমার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। তা না হলে আমার বুকটা এত কাঁপবে কেন, ওর দুঃখে শূন্য হয়ে যাবে কেন আমার সব অনুভূতি?

হেসে হেসেই আমি বলি, 'তোমার ভেতর যে বেড়ে উঠছে, ওটা তো আমি, আমার ওরস। কেউ কখনো নিজেকে হেলা করে, নিজের আশ্রয়কে

অবজ্ঞা করে! হয়তো বোকারা করে। রাজকন্যা, আমি কি অতটা বোকা?'

'প্রাচী কে?'

চমকালাম না আমি একটুও। কেঁপে উঠল না গলার স্বরও। খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'নাম শুনে তো মনে হচ্ছে একটা মেয়ে!'

'চেনো তুমি তাকে?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'কতটুকু চেনো?'

'একটুও না।'

'একটুও না!'

'না, একটুও না।

'তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি তার?'

'না। কথা হয়েছে।'

'সত্যি তুমি তাকে চেনো না?' অবিশ্বাসের স্বর রাজন্যার গলায়।

'না, সত্যি চিনি না। এতগুলো বছর কেটে গেল, অনেক আপনজনকেই তো চিনতে পারলাম না! ও তো আমার আপনজন না।'

'আপনজন না হলে তোমার ফোন নম্বর জানেন কীভাবে, তোমাকে ফোন করেন কেন তিনি?' রাজন্যা একটু থেমে বলে, 'তোমার দুটো ফোন সেট, একটা এখানে ফেলে গিয়েছিলে কালকে। তোমাকে এখানে না পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার আর কোনো নম্বর আছে কি না।'

'তুমি সত্যবাদীর মতো অন্যটার নম্বর দিয়ে দিয়েছ, না?' গম্ভীর হয়ে বলি আমি। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলি, 'কেউ না, স্রেফ কেউ না। প্রাচী নামের সেই কেউ নাকে নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি! বিষয়ের কি এতই অভাব আমাদের!'

'না, মোটেই বিষয়ের অভাব না। আমাদের ভালোবাসা নিয়েই আমরা কথা বলতে পারি সত্তর হাজার বছর।'

'না, পৃথিবী ধ্বংসের আগ পর্যন্ত।'

'না, পৃথিবী ধ্বংসের পরেও।'

রাজন্যাকে ভালোবেসে চুপচাপ আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে অনেক দিন। মরে যেতে ইচ্ছে করছে আজও। এখনই, ঠিক এখনই।

বাইরের গেটে শব্দ হচ্ছে। দোতলা থেকে দ্রুত নিচে নেমে খুলে দিলাম গেটটা। গাড়ি ঢুকে গেল গ্যারেজে। দরজা খুলে দিলেন ড্রাইভার। টলমল পায়ে বাবা নামলেন গাড়ি থেকে। একটু পর একটা মেয়ে। খুব আদর করে

মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরলেন বাবা, বাম হাত দিয়ে। ভারসাম্য রক্ষা করে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তারপর। কিন্তু সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি আমার দিকে।

শঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। চোখ দুটো বুজে এসেছে বাবার। কোনোরকমে মেলে দেখার চেষ্টা করলেন আমাকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে এগিয়ে এলেন দোদুল্যমান হয়ে। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'মাই সান, হোয়াই আর ইউ হেয়ার?'

'গনি চাচা ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি গেছেন।'

'কেন?'

'ওনার শাশুড়ি অসুস্থ।'

'ভেরি ব্যাড। বাই দ্য বাই—।' বাবা মেয়েটার দিকে হাত বাড়ালেন, 'কাম টু মি।' মেয়েটা এগিয়ে আসতেই আবার কোমর জড়িয়ে ধরলেন বাবা তার, 'মিলি—।' বাবা আমাকে ইশারা করে তাকে বললেন, 'মাই ডেয়ারেস্ট লিটল সান, রাফিদ। রিয়েলি হ্যান্ডসাম, না?'

'ইয়েস, লাইক ইউ।'

সিঁড়ির দিকে পা বাড়ান বাবা আবার। কিছুটা শব্দ করে উঠে যান তারা দোতলায়। অপলক চোখে তাকিয়ে দেখি আমি তাদের। মাথার ভেতর ঘুণপোকাটা চাড়া দিয়ে ওঠে আবার, কুটকুট করতে থাকে—খুনটা আমাকে করতেই হবে, দ্রুত, খুব দ্রুত।

বাবা তার রুমে ঢুকে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। নিচে দাঁড়িয়ে আমি এখনো। কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কেমন যেন স্থির হয়ে গেছি—চিন্তায়, চেতনায়, বোধে।

'স্যার, উপরে যাবেন না?'

চমকে উঠে ড্রাইভারের দিকে তাকাই আমি। অপরাধী চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি আমার দিকে। ম্লান হেসে বলি, 'হ্যাঁ, যাব।'

মাথা নিচু করে গেটের বাইরে চলে গেলেন তিনি। সামনের কোনো বাসায় যেন ভাড়া থাকেন। গেটটা বন্ধ করে দিলাম আমি।

রুমে এসেই চেপে ধরলাম মাথাটা। দু'পাশে, কানের ওপরে, দপদপ করছে তীব্রভাবে। চুপচাপ বসে আছি, কোনো কিছু ভাবতে পারছি না এখনো। কিন্তু চোখ দুটো কেন যেন ভিজে উঠছে। শিরশির করছে কান দুটো। মাঝে মাঝে খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে, এখন করছে।

ডান পাশে মা'র দেয়ালের ফুটো, পেছনে বাবার দেয়ালের ফুটো।

দুটোর দিকে তাকাই আমি। দুই রুমে দুজনকে, ঠিক দুজনকে না, তিনজনকে আজ ইচ্ছেমতো দেখব। তারপর যা মন চায় তাই করব।

পেঁচা ডাকছে পাশের বিল্ডিং থেকে। আমাদের পাশের বিল্ডিংটা অনেক পুরনো, সুশান্তরা থাকত সেখানে। অনেক দিন আগে ইন্ডিয়া চলে গেছে ওরা। এখন যেন কারা থাকে। নোংরা অবস্থা। বিল্ডিংয়ের কোনায় দুটো পেঁচা বাসা বেঁধেছে সম্ভবত। মাঝে মাঝেই অনেক রাতে ওখানে বসে থাকতে দেখি ও দুটোকে। শান্ত ও স্থির। হঠাৎ হঠাৎ এদিক-ওদিক তাকায়। কী যেন দেখে বড় বড় চোখে।

জানালার গ্রিলের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। কিন্তু কোনো কিছু দেখছি না। চোখের সামনে সব কেমন যেন একই লাগছে—ধূসর, ম্রিয়মাণ, স্থবির।

চমকে উঠলাম মোবাইলের শব্দে। খাটের কোনায় রাখা মোবাইলটা বাজছে, ধরতে ইচ্ছে করছে না। থেমে গেল শব্দ, বেজে উঠল আবার, একটু পরই। রাজন্যা কিংবা প্রাচী করলে দ্বিতীয়বার করত না। অন্য কেউ। এগিয়ে এসে সেটটা হাতে নিয়ে দেখি, অচেনা নাম্বার। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে রিসিভ করলাম ফোনটা। হাসতে হাসতে বনানী থানার সেকেন্ড অফিসার মুশফিকুর রহমান বললেন, 'ভাই, আমার তো সত্যি সত্যি পাগল হওয়ার অবস্থা। কী যে একটা ধাঁধা বললেন, কিছুতেই কিছু করতে পারছি না। তা—।' কিছুটা সিরিয়াস ভঙ্গিতে মুশফিক সাহেব বললেন, 'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম? সম্ভবত জেগেই ছিলেন। ঢাকা শহরের মানুষ এত তাড়াতাড়ি ঘুমায় নাকি! ঢাকা শহরে রাতই তো হয় বারোটার পর। কী, ঠিক কি না?'

'জি, ঠিক।'

'তাহলে তো বোধহয় জেগেই ছিলেন?'

'জি, জেগেই ছিলাম।'

'জরুরি কোনো কাজ করছিলেন নাকি?'

'না, তেমন কিছু না।'

'আচ্ছা, বিরক্ত করছি না তো আপনাকে?

বিরক্ত হচ্ছি—এত রাতে ফোন করার পর এটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু মোটেই আমি বিরক্ত হচ্ছি না। কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগছিল নিজেকে। একাকিত্ব জেগে বসেছিল। মুশফিক সাহেব ফোন করায় বেশ ভালোই লাগছে। সামান্য ধাঁধা নিয়ে একটা মানুষ এত সিরিয়াস, মজাই লাগছে।

'ধাঁধার উত্তরটা কি আমি বলে দেব?' আমি যে বিরক্ত না সেটা বোঝানোর জন্য হেসে হেসে বললাম আমি।

'অসম্ভব।' বেশ শব্দ করে বললেন মুশফিক সাহেব, 'ভাই রে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছি এ কয়দিন। সারাক্ষণ আপনার ওই ধাঁধার চিন্তা। ইনশাআল্লাহ, দু-এক দিনের মধ্যে বের করে ফেলব। এই শেষ মুহূর্তে সেটা আপনার মুখে শুনে পরিশ্রমকে পণ্ড করতে চাই না। তবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।'

'করুন।'

মুশফিক সাহেব একটু সময় নিয়ে বললেন, 'ধাঁধার ওই জিনিসটা কি গাছের কোনো ফল?'

'না।'

'নদী কিংবা সমুদ্রের কোনো মাছ?'

'না।'

'তাহলে কোনো ফুল কিংবা কোনো উপকারী গাছ।'

'না, ও দুটোর একটাও না।'

'কোনো প্রাণী-টানি না তো?'

'হ্যাঁ, কোনো একটা প্রাণী।'

বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মুশফিক সাহেব। গদগদ স্বরে বলেন, 'প্রাণীটির দুই পা, না চার পা?'

'দু'পা।'

'তাহলে তো মুরগি, না না মুরগি না।' মুশফিক সাহেব চিন্তিত স্বরে বলেন, 'সম্ভবত কোনো পাখি। ঠিক আছে না?'

'জি, ঠিক আছে।'

মুশফিক আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'বাকিটুকু আর বলতে হবে না। আমি ঠিকই বের করে ফেলব এবার।' মুশফিক সাহেব একটু থেমে বলেন, 'আপনাকে তাহলে আসল কথাটা বলে ফেলি। আজ সকালে আমার স্ত্রীকে বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধাঁধার উত্তরটা বের করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রকার তরকারি কিংবা ভাজি দিয়ে ভাত খাব না আমি। শুধু লবণ দিয়ে ভাত খাব।'

'ছি ছি, এটা কী করেছেন আপনি!'

'বলতে পারেন এটা আমার একটা সাধনা। আচ্ছা, আজ রাখি। ধাঁধার উত্তরটা বের করার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করব আপনাকে।'

বাবার ঘরের ফুটোতে চোখ রাখলাম আমি, সরিয়েও আনলাম সঙ্গে সঙ্গে।

হিন্দি একটা গান বাজছে কম্পিউটারে, সেই গানের তালে তালে বাবা নাচছেন। একটা আন্ডার প্যান্ট ছাড়া পরনে আর কিছু নেই তার। মেয়েটাও নাচছে, বাবার মতোই স্বল্প বসনে।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ইচ্ছে করছে আরো একবার চোখ রাখি ফুটোতে। কিন্তু রুচিতে বাধল। পেঁচা দেখার জন্য জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আবার। না, পেঁচা দুটো নেই। চলে গেছে দূরে কোথাও।

এ মুহূর্তে আর কিছুই দেখার নেই আমার। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলাম নিজের দু'চোখ। ফেটে আসতে চাচ্ছে ও দুটো।

ঘুম ভাঙল সুমীর চিৎকারে। দ্রুত দরজা খুলে বাইরে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। দোতলায় লম্বা একটা প্যাসেজ আছে আমাদের, মা সেই প্যাসেজ বরাবর হনহন করে হাঁটছেন। একবার এদিক যাচ্ছেন, আবার ওদিক যাচ্ছেন। মা'র হাতে একটা ক্যালকুলেটার। হাঁটছেন আর টিপছেন সেটা। কী যেন একটা হিসাব করছেন তিনি।

গায়ের ওড়না দিয়ে নাক আর মুখ ঢেকে সুমী কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল আমার। কাজ করে ও আমাদের বাসায়। চেহারায় লাজের আভা, কিন্তু চোখ দুটো হাসছে ওর। ফিসফিস করে ওকে বললাম, 'কখন থেকে মা এভাবে হাঁটছেন?'

'সেটা তো বলতে পারব না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তো দেখছি।'

'কিছু বলেছিস মাকে?'

'না। ভয় লাগছিল।'

'ঠিক আছে, তুই তোর কাজে যা। আমি দেখছি।'

সুমী কিছুটা দৌড়েই চলে গেল রান্নাঘরে। দাঁড়িয়ে রইলাম আমি স্থির হয়ে। খুব মনোযোগ দিয়ে মা হাঁটছেন, কিছুটা দ্রুত গতিতেই হাঁটছেন, আর ক্যালকুলেটার টিপছেন। বাবার ব্যায়াম করার থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরে আছেন মা, উপরের দিকে টাইট একটা টি-শার্ট পরা। খুবই অশালীন লাগছে মাকে। বাসায় যারা আছে, তাদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু প্যাসেজের পাশেই তনুদের বিল্ডিং, ওদের দুটো জানালা এদিকে। যে কোনো একটা খুললেই মাকে দেখতে পাবে যে কেউ। ভাগ্যিস, ওদের কেউ সম্ভবত ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো, জানালাও খোলেনি।

ধীর পায়ে মা'র দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। মা একপলক আমার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলেন আগের মতো। পাত্তাই দিলেন না আমাকে। দাঁড়িয়ে রইলাম আমি তার কাছাকাছিতেই। এরই মধ্যে দুবার পাশ

কেটেছেন তিনি আমার। তৃতীয়বারের সময় খুব নরম, গলায় বললাম, 'মা, আপনি কি ক্যালকুলেটারে টাকার হিসাব করছেন?'

'না।' শান্ত গলায় বললেন মা।

'আপনার বয়স কত হলো সেটা বের করছেন?'

'না।' আগের মতোই বললেন মা।

'অ সরি, আপনার জন্ম তারিখই তো জানা নেই আপনার। আপনি যখন জন্মেছেন তখন তো জন্ম তারিখ কেউ তেমন লিখে রাখত না।'

'না, লিখে রাখত। আমাদের চার বোন আর চার ভাইয়েরটা লেখা আছে। কেবল আমারটা লেখা নেই।'

'ভাই-বোনের মধ্যে আপনার সিরিয়াল নম্বর তো নয়। আগের আটজনের তারিখ লিখতে লিখতে সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল সবাই।'

কিছু বললেন না মা। ক্যালকুলেটার টিপতে টিপতেই মুচকি একটা হাসি দিলেন তিনি। খুব সাবধান হয়ে কথা বলতে হচ্ছে মা'র সঙ্গে। একটু এদিক-সেদিক হলেই রেগে আগুন হয়ে যাবেন। সামনে যা পাবেন তাই ভাঙতে শুরু করবেন, রাগ না থামা পর্যন্ত ভাঙবেন।

মা'র মুচকি হাসিতে প্রশ্রয় পেলাম একটু। তবুও কথা বলতে গিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। পটানোর জন্য কৌশল খাটাতে হবে আরো কিছুক্ষণ।

'মা, একটা জিনিস খেয়াল করেছেন আপনি?'

'কী?' কোনোরকম আগ্রহী মনে হলো না মাকে।

'আপনার জন্ম তারিখটা যদি জানা থাকত আমাদের!'

'কী হতো তাহলে?' একপলক তাকিয়ে কথাটা বললেন মা। একটু আগ্রহী মনে হলো এবার।

'মনের মাধুরী মিশিয়ে জন্মদিনটা পালন করতে পারতাম। সাত দিন আগে থেইে সারাবাড়ি কয়েক রঙের লাইট দিয়ে সাজিয়ে ফেলতাম; কেক আনতাম প্যারিস থেকে; ফুল আনতাম থাইল্যান্ড থেকে, সব থাকত অর্কিড; রাতভর গান হতো, নাচ হতো। গান গাওয়ার জন্য আপনার প্রিয় শিল্পী সনু নিগমকে আনতাম; নাচার জন্য আনতাম আপনার আরেক প্রিয় শিল্পী ঐশ্বরিয়া রাইকে; টাকা একটু বেশি বাড়িয়ে দিয়ে তার সদ্য ভূমিষ্ঠ মেয়েটাকেও আনতাম। ওই পিচ্চিটা তো আর নাচতে পারত না, আপনার কোলে চড়ে থাকত, পিটপিট করে তাকাত আর হাসত।'

'ঐশ্বরিয়া কি ওর মেয়েটাকে আনত?'

'কেন আনবে না। টাকা বলে কথা! বরং এই বয়সেই টাকা কামাই শুরু হচ্ছে বলে অভিষেক বচ্চন নিজেও চলে আসত। অবশ্য ওকে কোনো পেমেন্ট করতাম না আমরা। না, আবার করতেও পারতাম। আপনার জন্মদিন বলে কথা! দু-চার লাখ দিয়েও দিতাম। দু-চার লাখই তো। হাজার হলে ঐশ্বরিয়ার স্বামী। একটা প্রেস্টিজ আছে না তার!'

'আচ্ছা—।' মা হাঁটা বন্ধ করেন। গুরুত্ব নিয়ে আমার দিকে তাকান। আমি আগের চেয়ে সাবধান হয়ে যাই। একটু এগিয়ে আসেন তিনি আমার দিকে, 'এই প্যাসেজটা একবার হাঁটলে যদি .৭৫ ক্যালরির মতো খরচ হয়, তাহলে দুই হাজার পাঁচশ বার হাঁটলে কত ক্যালরি খরচ হবে, বল তো?'

মা'র হাত থেকে ক্যালকুলেটারটা নিলাম আমি। দ্রুত হিসাব করে বললাম, 'আঠারশ পঁচাত্তর ক্যালরি।'

'পঁচিশশ ক্যালরি খরচ করতে কতবার হাঁটতে হবে?'

আবার হিসাব করে বললাম, 'প্রায় তিন হাজার তিনশ তেত্রিশ বার।'

'তিন হাজার তিনশ তেত্রিশ—।' মা মনে মনে একটা হিসাব করে মেলাতে না পেরে বললেন, 'তিন হাজার তিনশ তেত্রিশ থেকে দুই হাজার পাঁচশ বাদ দিলে কত থাকে?'

'আটশ তেত্রিশ।'

'আমাকে তাহলে আটশ তেত্রিশ বার হাঁটতে হবে।' বলেই আমার হাত থেকে ক্যালকুলেটারটা প্রায় কেড়ে নেন মা, তারপর আবার হাঁটতে থাকেন। বিন্দু মাত্র দেরি না করে আমিও হাঁটতে থাকি মা'র সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সুযোগ বুঝে বলি, 'ক্যালরি খরচের হিসাবটা আপনাকে কে দিয়েছে, মা?'

'আমি একা একাই পেপার পড়ে বের করেছি।'

হিসাবটা ভুল, কিন্তু মাকে সেটা বলা যাবে না। আমি আরো কিছুক্ষণ হেঁটে বলি, 'এত ক্যালরি খরচ করে কী হবে মা?'

ফিক করে হেসে ফেলেন মা। কিছু বলেন না। প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করি মাকে। হাসিতে এবার শব্দ হয় না মা'র, উত্তরও পাই না। আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর মা হঠাৎ আমাকে খামচে ধরে বলেন, 'রাফিদ, বাপ আমার, আমি কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি বাপ? আমার শরীর খুব বেশি ঝুলে গেছে? মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ পড়ে গেছে?' মা'র নখগুলো পিঠে দেবে

যাচ্ছে আমার, 'মানুষ বুড়ো হলে কেউ আর ভালোবাসে না, না? আমার না খুব বয়স কমাতে ইচ্ছে করছে রে, বাপ। আমি আগের মতো হতে চাই। মানুষ কত কি আবিষ্কার করছে, বয়স কমানোর ওষুধ আবিষ্কার করেনি এখনো!' মা দু'হাত দিয়ে আমার মুখটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরে বলেন, 'আমি কি দেখতে খুব খারাপ হয়ে গেছি? খুব?'

কোনো উত্তর দিতে পারি না আমি। হাহাকারের মতো শোনায় মা'র প্রতিটি শব্দ। মা'র চোখে কোনো পানি নেই। পাথর হয়ে গেছেন তিনি, পাথর হয়ে গেছে তার চোখ দুটোও। কিন্তু হঠাৎ, হঠাৎ মা তার গায়ের টি-শার্টটা টান দিয়ে খুলে ফেলেন। চোখ বন্ধ করে ফেলে আমি। মা আমার মাথার চুলগুলো খুব জোরে টানতে টানতে বলেন, 'আমার ভেতরে কি আর কিছুই নেই রে, বাপ! আমি একেবারেই বাতিল হয়ে গেছি! দেখ না একবার আমাকে, দেখ না। বল না, বল না...।'

চোখের পাতা আরো চেপে ধরি আমি। কান দুটোও বন্ধ করি দু'হাত দিয়ে। চিৎকার করতে করতে মা পড়ে গেছেন মেঝেতে। আমার ডান পায়ের পাশে মাথা কাত করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন জোরে জোরে। আমি দ্রুত বসে পড়ি, জড়িয়ে ধরি মাকে। সমস্ত চেষ্টা দিয়ে আড়াল করি তাকে। আমার বুকের ভেতর নিথর হয়ে মা পড়ে থাকেন, কেবল তার ঘন ঘন নিঃশ্বাসে টের পাই—কিছু একটা করার সময় হয়েছে, খুব দ্রুত করতে হবে কাজটা। খুব দ্রুত, খুব দ্রুত।

রাজন্যা আমাকে কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, কী হয়েছে তোমার!' বাঁ হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে, ডান হাত দিয়ে কপালে নেমে আসা ওর মাথার চুলগুলো পেছনে ঠেলে, চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'সত্তর ঘণ্টা ঘুমাতে চাই আমি, রাজকন্যা। পুরো সত্তর ঘণ্টা!' খুব কৌশলে আলতো করে বিছানায় শুইয়ে দেয় রাজন্যা আমাকে। সমস্ত ক্লান্তি নিয়ে আমি স্থির হয়ে থাকি বিছানায়। আমার চোখের ওপর দুই আঙুল চেপে রাজন্যা দূরাগত গলায় বলে, 'আমি কি তোমাকে একটা গল্প শোনাব?'

চোখ মেলার চেষ্টা করি আমি। রাজন্যা বিরক্তি স্বরে বলে, 'চোখ খুলবে না। গল্প শোনার জন্য চোখ খুলতে হয় না। কান খোলা রাখলেই হবে।'

'আমার না একটা ভূতের গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'ভূত এসে তো ঘাড় মটকাবে!'

'না, তাহলে রাক্ষসের গল্প বলো।'

'রাক্ষস তো রক্ত চুষে খাবে!'

'তাহলে বরং দেবদূতের গল্পই বলো।'

রাজন্যা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'এক বাবা একদিন তার গাড়ি পরিষ্কার করছিলেন। চার বছরের একটা ছেলে আছে তার। তিনি হঠাৎ খেয়াল করেন, একটা পাথর দিয়ে ছেলেটি গাড়ির সামনের দিকটায় আঁকছে। ভীষণ রেগে গেলেন বাবা। হাতের কাছে থাকা হাতুড়ি দিয়ে তিনি আঘাত করলেন ছেলেটির হাতে।

চিৎকার করে ওঠে ছেলেটি। বাবা চমকে উঠে দেখেন, সব আঙুল থেঁতলে গেছে ছেলেটির। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে তার আঙুলগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন, রাখার কোনো উপায় নেই, কেটে ফেলতে হবে এগুলো এবং ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর ছেলে তার হাতের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা, আমার আঙুলগুলো কখন আবার নতুন হয়ে বেরুবে?

থমকে যান বাবা, চোখে পানি এসে যায় তার। দ্রুত বাসায় এসে ক্ষোভে-দুঃখে গাড়িটি পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু গাড়ির কাছে এসেই তিনি আবার থমকে যান, চমকে ওঠেন ভীষণভাবে। গাড়ির সামনের দিকে একটি লেখা—বাবা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। পাথর দিয়ে তার ছেলে কথাটি লিখেছে।

সমস্ত কষ্ট নিয়ে সেদিনই আত্মহত্যা করে বসেন বাবাটি।'

গল্প শেষ করে রাজন্যা আমার দিকে তাকায়। চোখ ছলছল করছে ওর। আমি ওর গালে একটা হাত রেখে বলি, 'আমাদের প্রত্যেকেরই এ ধরনের কিছু গল্প আছে। আছে না?'

'হ্যাঁ, আছে।' রাজন্যা ওর গালে রাখা আমার হাতটার ওপর ওর একটা হাত রেখে বলে, 'এ রকমই আরো একটা গল্প বলি তোমাকে। বাইরে যাবেন বলে মা তার লিপস্টিকটা খুঁজছিলেন। অনেকক্ষণ খুঁজেও না পেয়ে তার তিন বছরের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। মেয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে বলল, ওটা দিয়ে কাগজে লিখেছি আমি, মা।

রেগে যান মা সঙ্গে সঙ্গে। আচ্ছামতো পেটাতে থাকেন তিনি

মেয়েটাকে। অজ্ঞান হয়ে যায় সে একসময়। কিছুক্ষণ পর মা তার ভুল বুঝতে পারেন। মেয়েটাকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, চোখ খোলো, মামণি।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, ছোট্ট মেয়েটার ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেছে ততক্ষণে। চিৎকার করে ওঠেন মা। ঠিক সেই সময়টাতে বিছানার উপর থেকে একটা কাগজ উড়ে আসে তার সামনে। মা দেখেন, কাগজে তার লিপস্টিকের দাগ, ঠিক দাগ না, একটা লেখা—আই লাভ ইউ, মাম।'

রাজন্যা গল্পটা শেষ করে এবার কেঁদেই ফেলে। চোখের জল নিয়েই সে বলে, 'মাম, রাতে ফোন করেছিল।'

'কিছু বলেছেন?'

'সব দায়বদ্ধতা থেকে ফ্রি হতে বলেছেন!'

'অসম্ভব।' বিছানা থেকে ঝট করে উঠে বসি আমি। রাজন্যাকে খামচে ধরি। তারপর ওর পেটে একটা হাত রেখে বলি, 'ও আমাদের, ও আমাদের ভালোবাসার চিহ্ন, সমস্ত অনুভূতির নির্যাস।'

বড় বড় চোখ করে রাজন্যা আমার দিকে তাকায়। চোখ দুটো আগেই ভেজা ছিল, ভিজে যায় সেটা আরো, 'আই ডোন্ট কেয়ার, বাট—।' থেমে যায় ও।

থেমে থাকি আমিও। অনেকক্ষণ। মাথা নিচু করে আছে রাজন্যা। মুখটা আলতো করে তুলে ধরে বলি, 'সম্ভবত বিয়েটা করে ফেলা উচিত আমাদের। থেমে যাবে তাহলে সব কিছু। ফ্রি হওয়ারও প্রশ্ন আসবে না।'

স্থির চোখে রাজন্যা তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। কোনো কথা বলে না। বেশ কিছুক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ও বলে, 'মামের কথাটা শুনে সারাক্ষণ ওই গল্প দুটোর কথা মনে হচ্ছিল। মেরে ফেলব আমাদের ভালোবাসাকে! এত অবজ্ঞায়, এত অবহেলায়!' ঝট করে সোজা হয়ে বসে রাজন্যা, 'ইয়েস, বিয়ে করব আমরা। তিন দিনের মধ্যেই। কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি। আচ্ছা—।' রাজন্যা আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কি মন খারাপ হলো, রাফিদ!'

রাজন্যার একটা হাত ধরতে নেই আমি। ফোনটা বেজে ওঠে হঠাৎ। পকেট থেকে বের করে দেখি, বাবার ফোন। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বাবা বললেন, 'বাসায় চলে আসো, দ্রুত। আই অ্যাম ইন প্রবলেম।'

বাবার ঘরের সামনে একটা চেয়ারে বসে আছেন মা। ডান হাতে মাছ কাটার ছুরি, বাম হাতে চাবির গোছা। দরজার দিকে তাকালাম। তালা লাগানো।

বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি আমি মা'র দিকে। মূর্তির মতো স্থির হয়ে মা বসে আছেন, অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন বাবার দরজার দিকে, যেন দরজা খুলে যে-ই বের হয়ে আসবে তাকেই কুপিয়ে ফালিফালি করে ফেলবেন তিনি।

বাবা বসে আছেন ঘরের ভেতর, রাতে আসা মেয়েটাও। ফোনে বাবাকে বলে দিয়েছি কোনো কথা না বলতে। চুপচাপ বসে থাকতে। দরজাটা আমিই খুলে দেব।

মিনিট দশেক হয়ে গেছে। খুব ধীরে ধীরে, পা ঘষে ঘষে এগিয়ে যাচ্ছি মা'র দিকে। মা একবারও ফিরে তাকাননি আমার দিকে। স্থির হয়ে আছেন আগের মতোই, তাকিয়ে আছেন নিষ্পলক।

মা'র একেবারে কাছে এসে গেছি আমি। যত কিছুই ঘটুক, মা অন্তত আমাকে আঘাত করবেন না। তবুও সাবধান হয়ে আছি। যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

আরো একটু এগিয়ে গেলাম আমি। মা আগের মতোই।

পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম মা'র। হাঁটু গেড়ে পায়ের কাছে বসলাম তার। দু'হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'মা একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে। বলব?'

কোনো কথা বললেন না মা।

'মা, বলুন তো কত দিন আপনার কোলে মাথা রেখে ঘুমাই না আমি?' মা যথারীতি স্থির। আমি হাতটা আরো চেপে ধরে বললাম, 'মন খারাপ করা একটা ঘটনা বলব আপনাকে। তার পরও মনটা ভালো হয়ে যাবে আপনার। ঘটনাটা বলি?' মা'র হাত থেকে ছুরিটা সরিয়ে নিয়েছি আমি, 'জাপানি এক মা টের পেলেন, তার হাতে রাখা দুধের বোতলটা কেমন যেন কেঁপে উঠল একটু, কেঁপে উঠল বোতলের ভেতরের দুধগুলোও। মা খেয়াল করলেন, না, কেবল বোতল আর দুধগুলোই কেঁপে ওঠেনি; কেঁপে উঠছে ঘরের টেবিল, চেয়ার, দেয়ালে ঝোলানো ছবি, সবশেষে পুরো ঘরটাই। ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে, প্রচণ্ড ভূমিকম্প! মা দ্রুত তার তিন মাস বয়সী শিশুটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভূমিকম্পের পর জাপানের উদ্ধারকারী দল মা'র বাড়ি পৌঁছে দেখল, মারা গেছে মা। ছোট একটা গর্তের ভেতর দিয়ে হাত দিয়ে দলনেতা বুঝতে পারলেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীরটা। কিন্তু মহিলার ভঙ্গিটা অদ্ভুত লাগল তার কাছে। কেমন যেন উপাসনার ভঙ্গিতে দু'হাঁটুতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে আছেন তিনি। মনে হচ্ছে, কিছু একটা আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি দু'হাতে।

মাকে মৃত দেখে ফিরে আসছিলেন উদ্ধারকারী দলটি। কী মনে করে দলনেতা ঘুরে দাঁড়ালেন। গর্তের ভেতর দিয়ে বহু কষ্টে মাথাটা ঢুকিয়ে দিলেন তারপর। মা'র শরীরটা একটু কাত করতেই চমকে উঠলেন তিনি এবং চিৎকার করে উঠলেন, একটা শিশু, একটা শিশু...।

পুরো দল দ্রুত সজাগ হয়ে উঠল। তার চেয়েও দ্রুত ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে দেখল, মা'র শরীরের নিচে কম্বলে পেঁচানো একটি শিশু। তিন মাস বয়সী শিশুটি বেঁচে আছে তখনো!

ঘরটি ভেঙে পড়ার সময় বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য আড়াল করে রেখেছিল মা তার শরীর দিয়ে। ভেঙে পড়া বাড়িটি থেঁতলে দিয়েছে তার মাথা আর পেছনের দিকটা। কিন্তু শিশুটি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তখনো।

কম্বলটা খুলে ফেলল উদ্ধারকারী দল। একটা মোবাইল রাখা আছে সেখানে, একটা মেসেজ লেখা স্ক্রিনে—যদি তুমি বেঁচে যেতে পারো, তাহলে মনে রেখো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। টলটল করছে মা'র চোখ দুটো। উঠে দাঁড়ালেন মা ঝট করে। কাঁপা কাঁপা হাতে আমার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তার ঘরে। পেছনে পড়ে রইল চাবির গোছা আর ছুরিটা।

সম্ভবত বারো বছর পর মা'র কোলে মাথা রাখলাম আমি।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে ঘুম ভাঙল আমার। ইচ্ছেমতো ঘুমিয়েছি আজ, সারাদিন। ঘুম ভাঙার পর পরই মনে হলো, না, দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। আজ কিংবা কালের মধ্যেই খুনটা করতে হবে। আর দেরি করলে সমস্যা বাড়বে। ব্যাপারটা তখন আর আয়ত্তের মধ্যে থাকবে না।

খুনটা নিজের হাতেই করতে হবে, একা একাই করতে হবে। অন্যকে দিয়ে করালে সমস্যা। যে কোনো সময় যে কোনোভাবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তখন শুরু হবে আরেক সমস্যা।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—খুনটা করব কীভাবে?

খুন করার সহজ তিনটা উপায় হলো—

০১. হঠাৎ করে পেটের ভেতর ধারালো কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া।

০২. ঘুমের মধ্যে গলা কেটে ফেলা কিংবা কোনো কিছু দিয়ে মুখ ঠেসে ধরে শ্বাস রোধ করা।

০৩. খাবারের সঙ্গে কার্যকরী একটা বিষ মিশিয়ে দেওয়া।

আরো অনেক উপায় আছে, তবে উপরের তিনটার মতো সহজ কোনো উপায় জানা নেই আমার। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে লাশ লুকানো। খুন করা যতটা সহজ, লাশটা গুম করাটা তত কঠিন। খুন করে মানুষ যতটা না ধরা পড়ে, লাশ লুকাতে গিয়েই ধরা পড়ে বেশি। এই সময়টাতেই মানুষ তার আসল ভুলটা করে ফেলে, যে ভুল করে না সে-ই পার পেয়ে যায়।

ক্রিস্টিয়ানা লরেন্স তার স্বামীর পরকীয়া সংক্রান্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলে সিদ্ধান্ত নেন স্বামীকে মেরে ফেলবেন তিনি। দু'দিন এ বিষয়ে ভাবার পর একটা কুকুর কিনে আনেন তিনি বাসায়। তারও চার দিন পর ঘুমের মাঝে জবাই করে ফেলেন স্বামীকে। ঠাণ্ডা মাথায় দোকানে রাখা শূকরের মাংসের মতো টুকরো টুকরো করে ফেলেন লাশটাকে। এমনকি আগে থেকে কিনে আনা হাড়কাটার ছুরি দিয়ে টুকরো করে ফেলেন হাড়গুলোও। পলিথিনের

ছোট ছোট বিয়াল্লিশটা ব্যাগে মাংসগুলো ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেন লরেন্স। প্রতিদিন একটা একটা প্যাকেট বের করে কুকুরকে খেতে দিতেন। বিয়াল্লিশ দিনে ভ্যানিস করে দেন মাংসে পরিণত হওয়া স্বামীকে।

খুব সুদর্শন ছিলেন জোসেফ টি। টাকা-পয়সাও কম ছিল না তার। বদভ্যাসও ছিল একটা—মেয়ে পটিয়ে বাসায় আনা। বদভ্যাসের এখানেই শেষ হলে তেমন সমস্যা ছিল না। আসল সমস্যা হচ্ছে, নিজের কার্য হাসিলের পর প্রতিটা মেয়েকে গায়েব করে দিত সে।

পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জোসেফের বাড়িটা ছিল অনেক বড় এবং অনেক পুরনো। তেইশটা রুম ছিল সেই বাড়িতে। প্রতিটা মেয়েকে সে গলা টিপে মেরে ফেলত, তারপর আগে থেকে খুঁড়ে রাখা পুরনো মেঝেতে ঢুকিয়ে দিত লাশটিকে। গর্তটা আগের মতো মাটি দিয়ে ভরে ফেলে এত সুন্দর করে সে ইট দিয়ে মেঝেটা গেঁথে দিত, কারো কোনো বোঝারই উপায় থাকত না ওখানে একটা লাশ লুকানো আছে। যদিও জোসেফের তেমন কোনো বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছিল না। সেও কারো বাড়িতে যেত না, তার বাড়িতেও কেউ আসত না।

মাংস সাপ্লাইয়ের ব্যবসা ছিল মার্টিন গোমেজের। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মাংস সাপ্লাই দিত সে। ভালোই চলছিল তার ব্যবসাটা। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো—দ্রুত ধনী হওয়া দরকার তার। কীভাবে হওয়া যায়? মাংস সাপ্লাই ছাড়া সে তো আর কিছু পারে না। প্রতিদিন চারটা শূকর আর একটা গরু কেনার সামর্থ্য আছে তার। সেগুলোর মাংসই বিক্রি করে সে। বেশি টাকা পেতে হলে বেশি মাংস লাগবে। এত মাংস পাবে কোথায় সে!

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বার্গার খাচ্ছিল মার্টিন একদিন। হঠাৎ একটা টোকাই টাইপের ছেলে হাত পাতে তার কাছে। ছেলেটাকে দেখে ঝট করে একটা বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। খাবার আর কাজ দেয়ার কথা বলে বাসায় নিয়ে যায় তাকে। রুমে ঢুকে সোজা বাথরুমে নিয়ে জবাই করে ফেলে ছেলেটাকে। টুকরো টুকরো করে কেটে তারপর বিকেলের মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ছেলেটাকে। আটাশ কেজি মাংসের দাম বেশি পাওয়ায় সেদিন খুব ভালো ঘুম হয়েছিল মার্টিনের। তারপর থেকে সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন খুব ভালো ঘুম হতো তার।

কাহিনিগুলো বইতে পড়েছি, তবে লাশ গায়েব করার আরো অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু আমার মাথায় কোনোটাই ভালো কোনো পদ্ধতি মনে হচ্ছে না। কয়েক মাস ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি, এখনো পছন্দ হচ্ছে

না কোনো কিছু। তবে পছন্দ হোক অথবা না হোক, আগে খুন, তারপর অন্য কিছু।

দরজায় টোকা দিয়ে সুমী ঢুকল রুমে। চা নিয়ে এসেছে ও। আমার সামনে রেখে ম্লান গলায় বলল, 'ভাইয়া, আপনার মোবাইল কি বন্ধ?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'গনি আঙ্কেল ফোন করেছিলেন টিঅ্যান্ডটিতে। ওনার শাশুড়ি নাকি মারা গেছেন। তিন দিন পর ঢাকায় ফিরবেন।'

'কখন ফোন করেছিলেন?'

'এই তো একটু আগে।'

বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠল একটু। খুন করার সময় গনি মণ্ডল থাকবেন না বাসায়! আমার জন্য তাহলে সহজ হবে ব্যাপারটা। কোনো বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই পুলিশ এসে আগে সেই বাড়ির দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে, যেন দুর্ঘটনার আগ-পিছের সব ঘটনা কেবল দারোয়ানরাই জানে।

রাজন্যার কথা শুনে কান গরম হয়ে গেল আমার। কিন্তু শান্ত হয়ে রইলাম আমি। তার চেয়েও শান্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'কালকেই!'

'হ্যাঁ, কালকেই।' খুব জেদি স্বরে রাজন্যা বলল, 'বিয়ে আমরা কালকেই করব। কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিতে চাই না আমি।'

'আমিও না।'

'কিছুই করতে হবে না তোমার। সব ঠিক করে ফেলব আমি। টুকটাক শপিং লাগবে, সেটাও করে ফেলব। আচ্ছা, তোমার তো কালো রঙের পাঞ্জাবি পছন্দ। বিয়ের জন্য একটা লাল রঙের পাঞ্জাবি কিনব আমি। প্লিজ, না করবে না।'

'এসব পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবির কী দরকার?'

'দরকার আছে। বিয়ের পর ওটা যত্ন করে রেখে দেব। ছেলেমেয়ে বড় হলে ওদের দেখাব।' রাজন্যা একটু থেমে বলে, 'কোলাপুরি একটা স্যান্ডেলও কিনতে হবে। ভালো কথা, ফ্রেশ পাজামা আছে তো তোমার?'

'পাজামা পরব না, জিন্স পরব।'

'জিন্স পরে কেউ বিয়ে করে! ঠিক আছে, পাজামাও কিনে ফেলব একটা।' রাজন্যা কিছুটা শব্দ করে হাসতে হাসতে বলে, 'একটা রুমালও তো কিনতে হবে, না?'

'রুমাল দিয়ে কী হবে!'

'মুখ ঠেসে ধরে রাখতে হবে না তোমার!'

'মুখ ঠেসে ধরে রাখব কেন?'

'বিয়ের দিন বরদের মুখ ঠেসে ধরে রাখার নিয়ম আছে। ওই যে দেখা যায় না। ভালোই লাগে কিন্তু ব্যাপারটা।'

'তুমি কি জানো বিয়ের দিন বররা কেন মুখে রুমাল ঠেসে রাখে?'

'কেন?'

'দুটো কারণে।',হাসতে হাসতে আমি বলি, 'এক. খাবারের গন্ধে যেন মুখ দিয়ে লালা ঝরে না পড়ে। দুই. বিয়ের আসরে যদি কোনো প্রাক্তন প্রেমিকা থাকে, তাহলে যেন প্রেমিককে চিনতে না পারে।'

'তাই!'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার বেলায় তো ও দুটোর একটাও নেই। তুমি তো জানো, খেতে আমি একদম পছন্দ করি না। আর আমার তো প্রাক্তন-ট্রাক্তন বলে কিছু নেই। তুমিই স-ব।'

'আমার কাছে তুমিও। আমার সব পরিপূর্ণতা তোমাকে নিয়ে, তোমার স্পর্শই আমার সব মুগ্ধতা।'

'আমি জানি, রাজকন্যা।'

রাজন্যা একটু থেমে বলল, 'ক'দিন ধরে কি সব আজেবাজে স্বপ্ন দেখছি।'

'স্বপ্ন স্বপ্নই।'

'তারপরও—।' রাজন্যা বিষাদমাখা গলায় বলল, 'মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যায়।'

'একটা গান শুনতে পারো তখন।'

'ধুর, গান শুনতে এখন মোটেই ভালো লাগে না।'

'কোনো মুভি দেখতে পারো।'

'মুভি তো আরো দেখতে ইচ্ছে করে না।'

'তাহলে কবিতা পড়তে পারো।'

'হ্যাঁ, কবিতা পড়া যায়—

একদিন ভুল করে ঘোরতর স্বপ্নের মধ্যে জানালা খুলে রেখে
শুয়ে থাকব, ঘুমোব না।
একদিন ভুল করে ঈশ্বরকে মনে রাখব না।

কার কবিতা জানো?'

'না।'

'নাসিমা সুলতানার।'

রাজন্যার সঙ্গে কথা বলছি বটে, কিন্তু আমার মাথায় অন্য চিন্তা, খুনের চিন্তা। কিন্তু ওকে কোনো কিছুই বুঝতে দেওয়া যাবে না। নিজেকে হালকা রাখতে হবে। নিজেকে দুঃখী দুঃখী করে রাখা যাবে না কোনোভাবেই ।

'দোলন, মুমু, স্বপন, মিতি, ইমরানকে বলে রেখেছি। ওরাই তো আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। সব বিষয়ে সাহায্য করবে ওরা আমাদের। স্বপন তো একটা কাজি অফিসে কথা বলে রেখেছে এরই মধ্যে।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন হাসি হাসি মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'আমার কাছেও। স্বপন যখন কাজি অফিসের কথা বলছিল তখন তো হাসি আমার থামেই না।'

'আচ্ছা, তুমি যে কনসিভ করেছ, ওরা কি জানে?'

'না।'

'গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিশিসন নিতে যাচ্ছি আমরা। তুমি কি এটা বুঝতে পারছ, রাজকন্যা!'

'গুরুত্বপূর্ণ কি না জানি না। তবে প্রয়োজনীয়। জীবনে সব চাওয়াই তো পেয়েছি আমি, তুমিও। জীবনটা কানায় কানায় ভরে ফেলেছি, কোনো অভাব নেই সেখানে। কিন্তু কতটুকু সুখী—আমি, কিংবা তুমি? বলো? ধরে নাও প্রয়োজন-গুরুত্ব এখানে কিছু না, আমরা স্রেফ সুখী হওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি।'

ফোনের ওপাশে রাজন্যা, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার ঠিক পাশে বসেই কথা বলছে ও। মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে আমার কাঁধে, ওর অল্প অল্প নিঃশ্বাস ছুঁয়ে যাচ্ছে কান-চিবুক-গাল। ও যেন পরম নির্ভরতায় চেপে ধরে আছে আমার একটা হাত, আঙুল দিয়ে আল্পনা আঁকছে তালুতে। চোখ বুজে আসে আমার আবেশে, আনন্দে।

'পুরনো একটা কথা বলব তোমাকে?' ধ্যান ভেঙে দিয়ে রাজন্যা আমাকে বলে, 'বলব?'

'সুখের কথা, না দুঃখের?'

'ও দুটোর একটাও না, অন্য কথা।'

'বলো।'

'তোমার কি মন খারাপ?'

'হঠাৎ এ কথা!'

'আমার এ ডিশিসন নেওয়ার জন্য মন খারাপ করেছ তুমি, সেটা

বলব না। কয়দিন ধরে দেখছি, কেমন ম্লান তুমি। পানি না পাওয়া গাছের মতো শুষ্ক, প্রাণহীন।'

শব্দ করে হেসে উঠি আমি। পানি পাওয়া গাছের মতোই সজীব হওয়ার চেষ্টা করি। আমি তো শুষ্ক-প্রাণহীন হয়েই গেছি। কিন্তু রাজন্যা তো জানে না কোন কারণে। কিন্তু কারণটা যেন সে নিজেকে না ভাবে। চেষ্টা করে যাচ্ছি সেটা।

'ভালো কথা—।' আগের মতোই উৎফুল্ল হয়ে বলি, 'শুভ একটা ঘটনা ঘটবে। তোমার বন্ধুদের খাওয়াবে কী?'

'ওরা যা খেতে চায়, তাই খাওয়াব।'

'আর আমার জন্য?'

'একটা আসন রেখেছি তোমার জন্য। যে আসনে এসে বসলে সূর্যকে মনে হবে তোমার লাল গোলাপ, চাঁদকে মনে হবে মুক্তো দানা, পৃথিবীটা তরতাজা একটা দূর্বাঘাস। সেখানে আমিও থাকব।'

'কোথায়?'

'ভালো করে খুঁজে দেখো, পেয়ে যাবে।'

কাতর হয়ে ঘুমিয়ে আছেন মা। মা'র পাশে গিয়ে খাটে বসি। আমাকে চমকে দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দেন মা আমার দিকে। পরম মমতায় হাতটা জড়িয়ে ধরি আমি। কপালে হাত রাখি আরেকটা। সম্পূর্ণ পাল্টে গেছেন মা। পাল্টে গেছে তার শরীর, চেহারা, অবয়ব।

চোখের কোনা দুটো ভেজা মা'র। ভেজা মাথার নিচের বালিশটাও। বুকের ভেতরের তাজা ক্ষতটা আরো তাজা হয়ে যায়। আমি কেমন অসহায় হয়ে পড়ি। চারদিকে ঝাপসা, শূন্য।

ঝট করে মা উঠে বসেন বিছানায়। আমাকে আঁকড়ে ধরে বলেন, 'চল না, দূরে কোথাও চলে যাই আমরা।'

'কোথায় যাবেন আপনি, বলুন?'

'যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে।'

'চলুন।'

অবিশ্বাসী চোখে মা আমার দিকে তাকান। নির্ভরতার আবেশে মা'র হাতটা আরো জোরে চেপে ধরি আমি। আলতো করে কাঁধে মাথা রেখে বলি, 'আপনার মনে আছে, রাগ করে সারাদিন বাসার বাইরে

ছিলেন একদিন?'

'আছে।'

'কার ওপর রাগ করেছিলেন?'

'নিজের ওপর।'

'সারাদিন পর আবার ফিরে এসেছিলেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ফিরে এসেছিলেন?'

'জানি না।'

হেসে ফেলি আমি, 'আপনি জানেন।' হাসির মাত্রাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমি বলি, 'আপনি ফিরে এসেছিলেন নিজের জন্য। মা, আপনি কি জানেন—বাঁচতে হয় প্রথমত নিজের জন্য? নিজে বেঁচে থাকলেই আপনি মমতার ছোঁয়ায় আপনার সন্তানের কপালে ঘাম মুছে দিতে পারবেন আঁচল দিয়ে, টবে লাগানো গোলাপ চারাতে ফুল ফোটানোর আনন্দ পাবেন, সবুজ পাতা দেখে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবেন স্রষ্টাকে। মানুষ ভালোও বাসে প্রথমত নিজেকে।'

'যদি নিজের প্রতি সেই ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়?'

'নিজের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কখনো নষ্ট হয় না, অন্যের প্রতি রাগ-অভিমান-কষ্টে নিজেকে নষ্ট করে ফেলে সে।'

শুয়ে পড়েন মা আবার। আমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের গালের সঙ্গে ঠেকান। গরম পানির ছোঁয়াতে চমকে উঠি আমি। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে আবার। মাথাটা শূন্য হয়ে যায়, শূন্য হয় বোধ-চেতনা—স-ব। সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে আমি চিৎকার করে উঠি-থামুন মা, স্টপ!

কোনো প্রতিক্রিয়া নেই মা'র মাঝে। শুয়ে আছেন আগের মতোই। আমি নতজানু হয়ে মা'র দু'পায়ের ওপর কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে থাকি—আমি ক্ষমা চাচ্ছি মা আপনার কাছে। প্লিজ, পারডন মি। আপনার কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না আমার। সমস্ত কষ্ট থেকে আপনাকে দূরে রাখতে চাই মা, অনেক দূরে!'

হাঁটতে হবে আজ, অনেকক্ষণ। সব ভুলে রাতে আজ হাঁটার চেষ্টা করব আমি। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যাব, তবুও হাঁটব। কোনো কোনোদিন ইচ্ছে করে—হাঁটতে হাঁটতে সকাল করে ফেলব। দেখি, আজ সকাল করতে

পারি কি না।

বাসার বাইরে এসে দেখি, সমস্ত শহর ঝলমল করছে আলোতে। কোথাও কোনো কালো নেই। কেবল লাইট পোস্টের ছায়াগুলো মৃত মানুষের মতো স্থির হয়ে আছে লম্বা হয়ে। ব্যস্ত হয়ে হাঁটছে সবাই। ব্যস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছে কতগুলো কুকুরও। দুজনের একই উদ্দেশ্য—পেট ভরানো। পৃথিবীতে প্রতিটা জীব এসেছে বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে। কী হাস্যকর!

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় মাসুক বলত, বড় হয়ে সে ডাক্তার হবে, মানুষের সেবা করবে। সেই মাসুক মারা গিয়েছিল ডাক্তারের অবহেলাতেই। মাঝরাতে জ্বর হয়েছিল ওর একদিন। গ্রামের মাঝরাত। পাশের গ্রামে থাকা ডাক্তার সাড়া দেননি মাঝরাতের ঘুমের আয়েশে। সকালে উঠে সবাই দেখে, স্থির হয়ে আছে মাসুক।

মিনতি দিদি ভালোবেসেছিলেন। তিনি হিন্দু, ভালোবেসেছিলেন এক মুসলমানকে। মেনে নেয়নি পরিবার। নিজের ওড়না দিয়ে ফাঁস নিয়েছিলেন তিনি ঘরের ফ্যানের সঙ্গে।

সারাক্ষণ পুতুল খেলা আর পুতুল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সাবিহা পুতুলের মা ভাবত নিজেকে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তারপর যোগাযোগ ছিল না অনেক দিন। হঠাৎ দাওয়াত পেয়েছিলাম ওর বিয়ের। মাস চারেক আগে খবর পেয়েছিলাম, মা হতে গিয়ে মারা গেছে সাবিহা, চলে গেছে না-ফেরার দেশে।

বেশ ভালো লাগছে হাঁটতে। মানুষ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষ। শীত পড়েছে অল্প অল্প। রাস্তার পাশে পিঠা বানানোর দোকান বসেছে অনেক। সবাই কী আনন্দ নিয়ে পিঠা খাচ্ছে!

এয়ারপোর্টের মূল রাস্তায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠল। হাতে নিলাম ফোনটা। প্রাচী করেছে। বেশ ভালোই লাগে এখন মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে। কোনো চাওয়া নেই। স্রেফ গল্প।

'হ্যালো।' রিসিভ করলাম আমি ফোনটা।

'সম্ভবত আপনি বাসার বাইরে। শব্দ শোনা যাচ্ছে প্রচুর।'

'হাঁটতে ইচ্ছে করছে।'

'এ ইচ্ছেটা তো আপনার অনেক দিনের।'

'ঠিক অনেক দিনের না, কয়েক বছরের।'

'আপনার হাঁটার কথা শুনে আমারও হাঁটতে ইচ্ছে করছে।'

'চলে আসুন। আমি এয়ারপোর্ট রোডে আছি।'

'আসব?'

'আসুন না।'

'রাজন্যা হঠাৎ দেখে ফেললে আমাদের দুজনকে, কিছু মনে করবে না ও?' হেসে উঠে প্রাচী।

'রাজন্যার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন?'

'রেগে যেতাম।'

'ওর সঙ্গে সবার পার্থক্য হচ্ছে এখানেই। ও কোনো কিছুতেই অন্য কিছু মনে করে না। কথা শেষ না করে থেমে গেলে বলে না—তারপর? ও হচ্ছে শিশিরের মতো, যতক্ষণ পারে টিকে থাকে, তারপর মিলিয়ে যায়।'

'আপনাদের দুজনকেই আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।' প্রাচী একটু থেমে বলে, 'সম্ভবত দেখা হবে।'

'তাই!'

'জি। এবং সেটা দু-এক দিনের মধ্যেই।' হাসতে হাসতেই ফোনটা কেটে দেয় প্রাচী।

হাঁটা বন্ধ করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। হাঁটতে ইচ্ছে করছে না এখন। বাঁশের বাঁশি বাজাতে বাজাতে একজন এগিয়ে আসছে এদিকে। কাছে আসতেই হাত দিয়ে ইশারা করলাম তাকে। থেমে গেলেন তিনি, থেমে গেল তার বাঁশিও।

ভালো করে তাকালাম আমি লোকটার দিকে। সারাদিন খুব বেশি হলে পাঁচ-ছয়টা বাঁশি বিক্রি করেছেন। চা দিয়ে একটা গোল পাউরুটি খেয়েছেন সকালে, দুপুরে তেমন কিছু খাননি, সন্ধ্যায় ফুটপাতের হোটেলে এক প্লেট ভাত খেয়েছেন শুধু ডাল কিংবা কোনো ভর্তা দিয়ে, তারপর এক কাপ চা, এই তো সারাদিনের মেন্যু। সঞ্চয় বলতে বাকি বাঁশিগুলো। গ্রামে পড়ে আছে মা-বাবা-স্ত্রী-ছেলেমেয়ে। বিষাদের দিনলিপিতে বাঁশিতে তাই বিষাদের সুর। কিন্তু কই, তার চেহারাতে তো কোনো বিষাদ নেই। বিত্তবানদের চোখের নিচে যে কালি জমে, তার সামান্যতমও তো তার চোখের নিচে নেই! কোনো ক্লেদ নেই, হতাশা নেই, ভবিষ্যতের অজানা অন্ধকারের আতঙ্ক নেই! বেঁচে থাকাটা খুব আনন্দের, এদের কাছে, এর কাছে। কীভাবে?

কাঁধে ঝোলানো লোকটার ব্যাগ থেকে নিজেই একটা বাঁশি নিলাম আমি। মুখে নিয়ে বাজানোর চেষ্টা করলাম। ফুউস ফুউস শব্দ ছাড়া আর

কোনো শব্দ হলো না বাঁশিতে। হেসে ফেললেন লোকটি। কী অমলিন হাসি, কী স্নিগ্ধ আনন্দ! দাম মিটিয়ে দিলাম তাকে। আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন তিনি। বাজাতে বাজাতে দূরে চলে গেলেন, বাঁশির শেষ সুরটুকু শোনা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি জানি, খুব ভালো করে জানি, এই লোকটার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না আমার।

মোবাইল বেজে উঠল, প্রাচী ফোন করেছে আবার। রিসিভ করতেই হাসতে হাসতে বললেন, 'সরি, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, আপনি কি এখনো রাস্তায়?'

'জি।'

'তাহলে বাসায় পৌঁছার পর ফোন দিই?'

'না, এখন কোনো সমস্যা নেই।'

প্রাচী একটু থেমে থেকে বললেন, 'প্রেমে পড়াটা কি খুব দোষের?'

'মোটেই না।'

'যাকে ভালো লাগে, মানুষ তো তারই প্রেমে পড়ে, না?'

'হ্যাঁ।'

'ইচ্ছে করলে তাকে তো বিয়েও করতে পারে।'

'হ্যাঁ পারে।'

'কিন্তু আমার মুশকিল কি জানেন, আমি যার প্রেমে পড়েছি, তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে না আমার। কী যে কষ্ট হচ্ছে! জানেন, আমার না মরে যেতে ইচ্ছে করছে বারবার।'

মন খারাপ হয়ে গেল মেয়েটার কথা শুনে। এখন সত্যি সত্যি হাঁটতে ইচ্ছে করছে না আমার। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

বাবা দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের সামনে। আমাকে দেখে ইশারা করলেন। ঘরে ঢুকলাম আমি। কোনো ভণিতা না করে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড কথা বললেন আমার সাথে। বুকের ভেতরটা পুড়ছে, আস্তে আস্তে পুড়ে যাচ্ছে আমার সবকিছু।

ঘর থেকে বের হয়ে আসি আমি আস্তে আস্তে। সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে—না, কালকেই, খুনটা করতে হবে কালকেই।

মাকে খুন করে ফেললাম অবশেষে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে আজ আমার। যদিও তেমন ঘুম হয়নি রাতে। তন্দ্রার মতো ছিল। ভোরের আজানের সময় তন্দ্রাটুকুও দূরে হয়ে যায়। বিছানায় সোজা হয়ে বসে, সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে দূরে ঠেলে, লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ দুটো বুজে ফেলি আমি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিই—একটু পর, সকালে বাবা বাসা থেকে বের হওয়ার পর, কাজটা শেষ করব আমি, খুনটা করব আমি।

খুনটা করার জন্য সব কিছুই কেমন যেন অনুকূলে ছিল আমার। বাসায় অজানা এক কারণে বড় কোনো কাজের মেয়ে রাখেন না মা, অনেক দিন ধরে। সাত থেকে দশ বছরের কোনো মেয়ে এনে নেন গ্রাম থেকে। কিন্তু অলৌকিক কারণে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পালিয়ে যায় মেয়েগুলো। গত রাতে সুমীও পালিয়েছে। বাসার দারোয়ান গনি মণ্ডল তো দু'দিন আগেই শাশুড়ি সংক্রান্ত কারণে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন।

বাবা অনেক দিন নাস্তা করেন না বাসায়। বেশ সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যান, অফিসে গিয়ে নাস্তা করেন। আজও গিয়েছেন। কিন্তু বাবাকে আজ অন্য রকম লেগেছে, বয়সেও কেমন যেন কম দেখাচ্ছিল তাকে।

বাসা একদম ফাঁকা ছিল তখন। কেবল আমি আর মা। ঘুমাচ্ছেন তিনি তার রুমে। আমার রুমে আমি। পায়চারি করছি। অস্থির হয়ে এটা-ওটা ভাবছি। কিন্তু কীভাবে শুরু করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সুযোগটা মা-ই করে দিলেন। সুমীকে ডাকছিলেন। এগিয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মা আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, 'ও তো নেই।'

'কোথায় গেছে?' ক্লান্ত গলায় মা বললেন।

'সম্ভবত পালিয়েছে।'

কিছু বললেন না মা। ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক, মাকে দেখে তাই মনে

হলো। কোনোরকম চিন্তাযুক্ত মনে হলো না তাকে। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কিছু লাগবে মা, আপনার?'

'পানি খাব।'

প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেলাম আমি। সত্যি সত্যি সব কিছু অনুকূলে যাচ্ছে আমার। বিষ কিনে আনা হয়েছে। জাস্ট পানির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, তারপর দশ থেকে বারো মিনিট।

মা'র দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। আমার মা, আমার জন্মদাত্রী, আমার আশ্রয়, আমার শৈশব, যৌবন, ভালোবাসা—সব কিছু। গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা হয়েছিল একবার পেটে। কাজ হচ্ছে না ওষুধে। ইনজেকশন দিতে হবে। কিন্তু রাত করে হাসপাতালে নেওয়া যাচ্ছিল না। তখন গাড়ি ছিল না আমাদের। বাবা তখন এখনকার বাবা হয়ে উঠতে পারেননি। ঘুমাতে পারছিলাম না। ঘুমাতে পারেন না মা-ও। সারারাত পেটে বরফ পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ঠেসে রেখেছেন। একটু পরপর গরম হয়ে যায়, আবার ভিজিয়ে ঠেসে ধরেন। শেষ রাতের দিকে ব্যথা অনেকটা কমে গিয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঘুম ভাঙল দুপুরের দিকে। দেখি, মা তখনো বসে আছেন আমার পাশে, বরফ পানির পাত্রটাও আছে, কাপড়গুলোও আছে। মার চেহারায় না ঘুমানোর কোনো মলিনতা নেই, কোনো ক্লান্তি নেই, বরং তৃপ্তির একটা ছায়া ভেসে আছে চোখে, অবয়বে।

অনেক দিন পর কথাটা মনে পড়ল।

আরো একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম মা'র। মাথা নিচু করে ছিলেন তিনি। তুলে বললেন, 'কিছু বলবি, বাপ?'

'না।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আপনার কাছে একটু বসি?'

হাত বাড়ালেন মা। সেই হাতটা ধরে আমি পাশে বসলাম তার। একটু পর আমার মাথাটা ঠেসে ধরলেন তার কোলে। মাথার চুলের ভেতর আঙুল দিয়ে আঁকতে আঁকতে বললেন, 'ঢাকা শহরের কোথাও বট গাছ আছে রাফিদ?'

'কেন মা?'

'আমি জানতে চাচ্ছি আছে কি না?'

'আছে।'

'বড় বট গাছ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব বড়?'

'অনেক বড়।'

'পাশে কি কোনো নদী আছে?'

'ঠিক নদী না, খালের মতো আছে। যদিও সেটা নদীই ছিল। দখল হতে হতে এখন খাল হয়ে গেছে। তবে বর্ষাকালে চারপাশ ভরে যায়। তখন বড়সড় নদীই মনে হয়।'

'আমাকে একদিন নিয়ে যাবি সেখানে। আমি সারাদিন সেই গাছের নিচে বসে থাকব, নদীর পানি দেখব। তুই কি জানিস—নদীর যে পানিটা আমরা একবার দেখি, সেই পানিটা আর কখনোই দেখতে পাই না। স্রোতে সেই পানি ভেসে যায় অজানায়, অন্য জায়গায়।' মাথার চুলগুলো টানতে টানতে মা বলেন, 'দুটো ঘটনা আছে আমার জীবনে। কাউকে বলিনি আমি। তোকে আজ বলব। একটা শুনে তুই হাসবি, আরেকটা শুনে কষ্ট পাবি। এবার বল, কোনটা আগে বলব?'

'হাসিরটা।'

'তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। তখনকার ফাইভে পড়া মেয়েগুলো কিন্তু বেশ বড়সড় হতো। আমাদের বাড়ি থেকে একটু ফাঁকে একটা দীঘির মতো ছিল। পাশে ছিল একটা বিশাল বটগাছ। শেকড়গুলো এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে! কয়েকটা শেকড় দীঘির দিকে চলে গিয়েছিল। তারই একটা শেকড়ের ওপর বসে আছি। পা দোলাচ্ছিলাম আনন্দে। হঠাৎ পানিতে পড়ে যাই। সাঁতার জানতাম আমি। কিন্তু সেদিন কেন যেন সাঁতরাতে পারছিলাম না। হাত-পা নাড়ছি, কিন্তু ডুবে যাচ্ছি নিচের দিকে। মনে হচ্ছিল কে যেন টেনে ধরছে নিচ থেকে। চিৎকারও করতে পারছি না তখন।' থেমে যান মা।

'এটা কি হাসির ঘটনা হলো!'

'কথা তো শেষ হয়নি আমার।' পা দুটো টানটান করে মা বলেন, 'আমাদের গ্রামের মসজিদের হুজুর যাচ্ছিলেন দীঘির পাশ দিয়ে। তিনি হঠাৎ দেখে ফেলেন আমাকে। দ্রুত পানিতে নেমে হাত টেনে ধরেন আমার। আস্তে আস্তে দীঘির কিনারায় এনে ছেড়ে দেন হাতটা।' মা হাসতে হাসতে বলেন, 'মজাটা এখনো শুরু হয়নি। আচ্ছা, পানি খেতে চাইলাম না আমি!'

পানি আনার জন্য উঠতে নিই আমি। কিন্তু আমার মাথাটা ঠেসে ধরে বলেন, 'ঠিক আছে পরে খাই, আগে ঘটনাটা বলে নিই। তারপর হয়েছে কি শোন—।' মা আবার হাসতে শুরু করেন, 'বাড়ি ফিরে সারাক্ষণ হুজুরের

চেহারা ভাসতে থাকে আমার চোখের সামনে। পড়তে বসি, অক্ষরগুলো চোখে পড়ে না আমার, হুজুরের চেহারা হয়ে যায় সেগুলো; খেতে বসি, ভাত দেখি না সামনে, প্লেটের মাঝে হুজুরের মুখ। ঘুম হয় না রাতে, চাঁদের দিকে তাকাই, কোথায় চাঁদ, আকাশে ভেসে আছে হুজুরের মাথা। একদিন স্বপ্ন দেখি কি, হুজুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে আমার। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস—হুজুর আমার থেকে না হলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বড়, কিন্তু বিয়ের পর পরই ছোট হয়ে গেছেন তিনি। আমার হাত ধরে নাচছেন আর গান গাচ্ছেন গলা ফাটিয়ে!'

'ছোটকালে আপনি কি বাংলা সিনেমা দেখতেন খুব?'

'খুব দেখতাম না। আম্মা সিনেমা দেখতে ভালোবাসতেন, মাঝে মাঝে যেতেন সিনেমা হলে, আমাকেও নিয়ে যেতেন তখন। টেলিভিশন তো তখন ছিল না বললেই চলে।'

'হুজুরকে ভুলে গেলেন কবে?'

'তোর বাবাকে দেখার পর।'

'বাবাকে কোথায় দেখলেন আপনি?'

'তোর বাবা আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হন কিন্তু।'

'এটা তো কখনো জানতাম না!'

'তোর বাবা ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমাদের বাড়িতে আসেন। ওনাদের ওখানে ভালো কোনো স্কুল না থাকায় পড়তে আসেন এখানে। খুব ভালো ছাত্র ছিলেন তোর বাবা। ভালো রেজাল্ট নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করার পর কলেজেও ভর্তি হন আমাদের বাড়িতে থেকে। কলেজেও ভালো রেজাল্ট করেন তিনি। এরপর শহরে ভর্তি হতে হবে। তোর দাদাদের অবস্থা অবশ্য তেমন ভালো ছিল না। একদিন শুনি কি জানিস—তোর বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে। তোর বাবার লেখাপড়ার সব খরচ তোর নানা দেবেন।'

'তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল আপনাদের।'

'হ্যাঁ। বিয়ের পর তোর বাবা শহরে পড়তে যান, আমি গ্রামেই পড়ে থাকি। শহরে পড়া শেষ করার পর তোর বাবা চাকরির জন্য পাগল হয়ে যান। নিয়ে যেতে হবে না আমাকে! এত ভালো ছাত্র, তবুও ভালো কোনো চাকরি হয় না। শেষে চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারি একটা চাকরি পান তিনি।' মা খুক করে একটু হেসে বেশ আনন্দ নিয়ে বলেন, 'ওই চল্লিশ হাজার টাকা কে দিয়েছিল জানিস?'

'কে?'

'তোর নানি। আব্বা তো কিছুতেই ওই ঘুষের টাকা দেবেন না। আব্বার এক কথা—ছেলে সারাজীবন বেকার থাকবে, তবু ঘুষ দিয়ে চাকরি নেবেন না। মা তখন তার প্রায় সব সোনার গয়না চুপ করে বিক্রি করে ওই টাকাটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। তখন তো চল্লিশ হাজার টাকা অনেক টাকা। সোনা ছিল আড়াই হাজার টাকা ভরি।'

'নানির এত সোনা ছিল!'

'কিন্তু বছর তিনেক চাকরি করার পর তোর বাবার চাকরিটা চলে যায়।'

'কেন!'

মা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকেন, কিছু বলেন না। চেহারাটা হঠাৎ ম্লান হয়ে যায় তার। আমি মা'র একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'থাক, বলতে ভালো না লাগলে বলার দরকার নেই।'

শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মা বলেন, 'তোর বাবা তার এক মেয়ে কলিগের সঙ্গে কী যেন করেছিলেন। ব্যাপারটা জেনে যায় সবাই। চাকরি থেকে বাদ দেয় তোর বাবাকে।'

'তারপর বাবা ব্যবসা শুরু করেন, না?'

'হ্যাঁ। সেখান থেকেই এ পর্যন্ত। যা তো—।' মা আমাকে ঠেলে তুলে বলেন, 'পানি নিয়ে আয়। বললাম না পানি খাব।'

পানি নিয়ে আসা মানেই সময় শেষ মা'র। সিদ্ধান্তটা দুলতে থাকে আমার মাঝে। সময় নেওয়া প্রয়োজন আরো একটু। মা'র সামনেই বসে আছি আমি। দু'হাতের মাঝে তার একটা হাত নিয়ে বলি, 'দুটো ঘটনা বলতে চেয়েছেন আপনি আমাকে। একটা বলেছেন, আরেকটা বলবেন না?'

ধুম মেরে বসে থাকেন মা। কোনো কথা বলেন না। মা'র চোখের দিকে তাকাই আমি। চোখ ভিজে উঠেছে তার। আরো হাত চেপে ধরি আমি। মা ভেজা ভেজা গলায় বলেন, 'একটা বিড়ালের বাচ্চাকে পানিতে ফেলে দিয়েছিলাম আমি একবার।'

'কেন!'

'তা তো জানি না। ওই দীঘিটার কাছেই বাচ্চাটাকে ঘুরঘুর করতে দেখি। খুবই ছোট্ট ছিল বাচ্চাটা। কী মনে করে পা দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দেই পানিতে। চোখের সামনে বাচ্চাটা ডুবে মারা গেল! আমার কী মনে হয় জানিস—।' মা হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'ওই বাচ্চাটার অভিশাপে আমার আজ এই অবস্থা! কই, ওটা ছাড়া আমি তো কোনো পাপ করিনি! কারো প্রতি অন্যায় করিনি! এবার বল, আমার কেন এমন হলো!'

জোর করে মাকে শুইয়ে দিই আবার। মা ঝট করে উঠে বসেন। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'আমার মাথাটা কেমন যেন করছে রে, রাফিদ! গরম লাগছে আমার। গা পুড়ে যাচ্ছে। দেখ দেখ—।' গা থেকে কাপড় খুলতে খুলতে মা বলেন, 'আমার কাপড়েও আগুন লেগে গেছে! সারা ঘরে আগুন লেগে যাবে এখন। আগুন আগুন...।' চিৎকার শুরু করে দেন মা।

জাপটে ধরি আমি মাকে। বিছানায় এনে শুইয়ে দিতে চাই। মা আমার হাত থেকে ছুটে যেতে চান। গায়ের সবটুকু পোশাক খুলে ফেলার চেষ্টা করেন। আরো শব্দ করে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'বাইরে যাব আমি, বাইরে যাব আমি। দম আটকে আসছে আমার। বুক চেপে আসছে আমার। বাইরে যাব, বাইরে যাব...। রাস্তা দিয়ে আমি দৌড়াব, গ্রামের বাড়ি যাব, দীঘির কাছে যাব, বিড়াল বাচ্চাকে বাঁচাব, ওর পা ধরে মাফ চাইব...।' মা ঝটকা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, 'ওই যে, ওই যে, বিড়ালের বাচ্চাটা এসেছে, ওর পা ধরতে দে আমাকে, মাফ চাইতে দে...।' মেঝের ওপর ঠাস হয়ে পড়ে যান মা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ছাদের দিকে, কিন্তু চোখ দুটো স্থির, নিস্পলক, ঘোলাটে।

দ্রুত আমি ডাইনিংয়ে গিয়ে পানি ঢালি গ্লাসে। গ্লাসটা নিয়ে আমার বেডরুমে যাই। তোষকের কোনা থেকে ছোট্ট একটা প্যাকেট বের করে তার সবটুকু ঢেলে দেই পানিতে।

তারপর?

তারপর মা'র সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলি, 'মা, পানি।'

শান্ত মেয়ের মতো মা মেঝেতে উঠে বসে পানির গ্লাসটা হাতে নেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণার্তের মতো অর্ধেকের কিছু বেশি পানি গিলে ফেলেন এক নিঃশ্বাসে। তারপর শান্ত হয়ে বসে থাকেন অনেকক্ষণ।

পুরো তেইশ মিনিট সময় লাগল কাজটা শেষ করতে। আরো কম সময়ে করা যেত—মুখ কিছু দিয়ে ঠেসে ধরে শ্বাস রোধ করা কিংবা গলাটা এক টানে ধারালো কিছু দিয়ে কেটে ফেলা অথবা গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু কোনোটাই সম্ভব হয়নি আমার। মা'র মুখ কিছু দিয়ে ঠেসে ধরব, চোখ বড় হয়ে যাবে মা'র, গোঙাতে গোঙাতে স্থির হয়ে যাবেন, খুব কাছ থেকে এটা দেখা খুবই কঠিন আমার জন্য।

গলা কাটাটাও কঠিন একটা কাজ। দু'ভাগ হয়ে গেছে মা'র গলা, ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে সেখান দিয়ে, নিঃশ্বাস নিতে না পারার কষ্টে গরগর করছেন, এটা দেখে আমি নিজেই মারা যাব।

গায়ে আগুন লাগিয়ে মারাটা সবচেয়ে ভয়াবহ। যে মায়ের শরীর থেকে আমার সৃষ্টি, সেই শরীরটা ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে; চিৎকার করছেন মা, কিন্তু সাহায্য করছি না তাকে! কুঁকড়ে যাচ্ছেন তিনি, চেয়ে চেয়ে দেখছি আমি তা; অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব আমার জন্য।

সুতরাং বিষপান।

গ্লাসের পানিটুকু খাওয়ার পর মিনিটখানেক বসে ছিলেন মা, চুপচাপ। তারপর হঠাৎ গলার কাছে হাত দিয়ে বলেন, 'আমার এমন লাগছে কেন, রাফিদ! গলা তো পুড়ে যাচ্ছে!'

নিস্পৃহভাবে মা'র গলার কাছে হাত রাখি আমি। মা কাতরাচ্ছেন। নীল হয়ে গেছে তার চেহারা। চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নিজের গলা নিজেই চেপে ধরলেন দু'হাত দিয়ে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মা'র নখগুলো আস্তে আস্তে দেবে যাচ্ছে গলার মাংসে, চামড়া ফেটে যাচ্ছে, সাদা দেখাচ্ছে ওই জায়গাগুলো, সাদা বদলে লাল হয়ে যাচ্ছে তারপর, রক্তের ফোঁটা তৈরি হচ্ছে ওখানে, গড়িয়ে পড়তে লাগল একটু পর।

ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি। পনের মিনিট হয়ে গেছে। হাত রাখলাম মা'র কপালে। একপলক তাকালেন তিনি। ছোট হয়ে এসেছে তার চোখ দুটো। নিষ্প্রভ, ম্লান। কোনোভাবে একটা হাত এগিয়ে দিলেন তিনি আমার দিকে। চেপে ধরলাম আমি হাতটা। কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মৃত মাছের মতো ফ্যাকাসেও দেখাচ্ছে কিছুটা।

চোখ দুটো আবার বুজে ফেলেছেন মা। সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে গেছেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল করলাম ঠোঁটের কোনায় একটা মাছি এসে বসেছে। মানুষ মারা গেলে প্রথম নাকি ছোট ছোট প্রাণীরা টের পায়। মা কি মারা গেছেন! হাতটা ছেড়ে দিলাম আমি। ঝুপ করে পড়ে গেল সেটা বিছানায়। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না—মারা গেছেন মা। ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল আমার, অনুভূতিহীন মনে হচ্ছে সব কিছু, স্থির হয়ে আছে চারদিক। কিন্তু আমি কাঁদছি। দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে আমার। বুকের ভেতর চেপে আসছে। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কোনো শব্দ করতে পারছি না। ঝাপসা চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি মা'র দিকে।

আমার মা, আমার জন্মদাত্রী, আমার আশ্রয়—মারা গেছেন! তিনি আর কখনো চুলে বিলি কাটবেন না আমার, মন খারাপ করে রাখলে এক মগ কফি এনে পাশে দাঁড়াবেন না আর, জগতের সব কাতরতা গলায় এনে বলবেন না, 'আমার দুই ছেলে-মেয়ে তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তুই যাবি কবে?'

মাথার ভেতর চিনচিন করতে থাকে আমার। দু'পাশে কেমন যেন চেপে আসতে থাকে, কপাল গরম হয়ে ওঠে প্রচণ্ড। দেয়ালের সঙ্গে গুঁতোতে গুঁতোতে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—এই যে শুনছেন, শুনতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি না আমার মাকে মেরে ফেলেছি, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছি!

চেতনাহীন হয়ে কতক্ষণ মেঝেতে পড়ে ছিলাম, বলতে পারব না। মোবাইলের শব্দে আস্তে আস্তে জেগে উঠি আমি। পকেট থেকে বের করে রিসিভ করতেই রাজন্যা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তোমার জন্য একটা সুসংবাদ আছে, রাফ!'

কথা বলি না আমি। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ি, শব্দহীন। রাজন্যা কিছুটা উদগ্রীব হয়ে বলে, 'তুমি শুনতে পেয়েছ কি বলেছি আমি?'

'হ্যাঁ।' অস্পষ্ট স্বরে বলি আমি।

'সুসংবাদটা শুনতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

'বলো।'

'আজ আমরা বিয়ে করছি, আর আমাদের সঙ্গে মা থাকবেন। কী—।' রাজন্যা হাসতে হাসতে বলে, 'মা থাকবেন, তার মানে গার্ডিয়ান ছাড়া বিয়ে করতে হচ্ছে না আমাদের। এটা একটা সুসংবাদ না, বলো?'

'খুব সুসংবাদ।'

'বিয়েটা হবে রাতে। মা বলেছে, সব কিছু ঠিক করে আমাকে জানাবে। একটু পর আমি শপিংয়ে যাব, কিছু কেনাকাটা করতে হবে। তুমি তো আবার শপিংয়ে যেতে মোটেই পছন্দ করো না, না হলে তোমাকে নিয়ে যেতাম। আমি কিন্তু অন্য রকম একটা শাড়ি কিনব। কারো পছন্দে নয়, আমার পছন্দে। তোমার পাঞ্জাবিটাও কিনব আমি, আমার পছন্দে। বিয়েতে একটা ছেলের কী কী প্রয়োজন সেটা আমিও জানি না, তুমিও না। বিয়ের জিনিসপত্র বিক্রি করে না, ওইসব দোকানের একটায় গিয়ে সব জেনে নেব, তারপর পছন্দমতো একটা একটা করে কিনব। তোমার কোনো রিকয়্যারমেন্ট

আছে?'

'না।'

'একেবারেই নেই!'

'না।'

'আচ্ছা—।' রাজন্যা গলার স্বর পাল্টে বলে, 'তোমার কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন? বিয়ের কথা শুনে তুমি কি নার্ভাস ফিল করছ? ওহ—।' রাজন্যা বিরক্তি নিয়ে বলে, 'টিঅ্যান্ডটিটা বাজছে। একটু রাখো তো, রাফ। ওখানে কথা শেষ করে পরে আবার কথা বলছি। মোবাইল এনগেজড পেয়ে মা বোধহয় ফোন করেছে।'

রাজন্যা কেটে দিল ফোনটা। মা'র দিকে তাকালাম আমি। তিনটা মাছি এসে বসেছে মার ঠোঁটে। একটু এগিয়ে গেলাম তার দিকে। মুখের কোনা দিয়ে সাদা সাদা কী যেন বের হচ্ছে। মা'র আঁচল দিয়ে মুছে দিতেই আবার বের হতে লাগল সেগুলো। হাঁ হয়ে আছে মা'র মুখটা। বন্ধ করে দিলাম আমি, আবার ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট দুটো।

মোবাইলটা বেজে উঠল আবার। মা'র কাছ থেকে সরে এসে রিসিভ করলাম, 'রাজন্যা?'

খা খা করে হেসে উঠলেন সেকেন্ড অফিসার মুশফিক সাহেব, 'আরে ভাই, রাজন্যাটা কে আবার? সরি, ব্যাপারটা বোধহয় ব্যক্তিগত। আমি আসলে খুব আনন্দ নিয়ে ফোন করেছি আপনাকে। আপনার ধাঁধার উত্তরটা বের করে ফেলেছি আমি। এত সহজ একটা উত্তর, আর সেটা বের করতে গিয়ে আমার কয়েক দিন কয়েক রাত কেটে গেল!'

'ধাঁধার উত্তরটা জানা হয়ে গেলে তখন সেটা সহজই মনে হয়।'

'এটা ঠিক বলেছেন আপনি। ধাঁধা হচ্ছে অনেকটা সরল অঙ্কের মতো। মেলাতে পারলে খুবই সোজা, না পারলে মহাকঠিন।' মুশফিক সাহেব খুক করে একটু কেশে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি এখনই আপনার বাসায় একটু আসতে চাই।'

চমকে উঠি আমি, 'কেন?'

'ধাঁধার উত্তরটা আমি নিজ মুখে আপনার সামনে বসে বলতে চাই। তার আগে মিষ্টি মুখ করাতে চাই আপনাকে। আরে ভাই, ধাঁধার উত্তর বের করা তো, আগেকার সেই ম্যাট্রিক পাস করা! এখনকার পোলাপানরা তো কুইজের মতো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই পাস করে যায়। আমাদের সময় ইয়া বড় বড় সব প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করতে হতো। তা ভাই, আসব আপনার

বাসায়?'

মা'র দিকে তাকালাম আমি। মাছির সংখ্যা বেড়ে গেছে! কয়েকটা পিঁপড়াও এসে উপস্থিত। মার কানের পাশ দিয়ে বেয়ে উঠছে সেগুলো।

'কী ভাই, চুপ হয়ে আছেন কেন, আসব?'

'মুশফিক ভাই, আমি তো এখন একটু বাইরে আছি।'

'বাইরে আছেন! তাহলে তো আরো ভালো হলো। কোথায় আছেন বলুন, আমার মোটরসাইকেল আছে। একটানে চলে আসব আপনার কাছে। মিষ্টি খাওয়ার পর আরাম করে এক কাপ কফি, তারপর একটা পান খাওয়া যাবে। আপনার বাসায় তো মনে হয় পানের কোনো ব্যবস্থা নাই!'

'ইয়ে মুশফিক ভাই—।' জীবনে খুব কম মিথ্যা কথা বলেছি। ঝট করে মিথ্যা কথা বানানোটাও খুব কঠিন আমার কাছে। কী যে বলব বুঝতে পারছি না।

'থামলেন কেন! বলেন না।'

'ইয়ে, কী বলি..., একটা বান্ধবীর সঙ্গে আছি তো।'

খা খা করে আবার হেসে উঠলেন মুশফিক সাহেব, 'তাই বলেন। ঠিক আছে আমি আপনাকে বরং ঘণ্টা দুয়েক পরে ফোন দিই।'

'থ্যাংক ইউ, মুশফিক ভাই।'

'থ্যাংক ইউ ট্যাংক ইউ যাই বলেন, আমি কিন্তু আজ আপনাকে মিষ্টি না খাওয়ায়ে ছাড়ছি না। ধাঁধার উত্তর বের করা না তো, এক চান্সে ম্যাট্রিক পাস করা। বুঝতেই তো পারছেন কতটুকু উত্তেজনার মধ্যে আছি।'

মা'র দিকে তাকালাম আবার। চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। কোথা থেকে যেন একটা বিড়ালের বাচ্চা এসে দাঁড়িয়ে আছে তার মাথার কাছে। আমাকে দেখে মোটেও ভয় পেল না। বরং ভালো করে কিছুক্ষণ দেখে মা'র মুখের পাশটা চাটতে লাগল সে। পরিষ্কার করে ফেলল মার মুখটা, নিমিশেই। তারপর দু'পা সামনের দিকে মেলে দিয়ে বসে পড়ল আয়েশ করে।

মাথা আউলা হয়ে গেল আমার। এখানে বিড়ালের বাচ্চা এলো কোথা থেকে! বড় কোনো বিড়াল না হয় দেওয়াল বেয়ে, জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারবে। এই ছোট্ট বাচ্চাটা তো ঠিকমতো হাঁটতেই পারে না। তাহলে কি ঘরে কোনো বাচ্চা দিয়েছে বিড়াল! না, সেটাও তো সম্ভব না। আমাদের ঘরে বিড়াল ঢোকা অসম্ভব, কারণ সব জানালায় নেট লাগানো। মশাই যেখানে ঢুকতে পারে না, বিড়াল সেখানে ঢুকবে কীভাবে!

বিড়ালের বাচ্চাটা বসেই আছে। ভীষণ রাগ হলো আমার। তেড়ে গেলাম তার দিকে। লম্বা দুটো লাফ দিয়ে সেটা পালিয়ে গেল খাটের নিচে। উপুড় হয়ে সেখানে তাকালাম, পরিষ্কার খাটের নিচটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কোনো কিছুর একটা টুকরোও নেই সেখানে।

আরো কয়েক জায়গায় খুঁজলাম, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। না, কোথাও নেই প্রাণীটা। হাওয়া হয়ে গেছে একেবারে!

মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। রাজন্যা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মা সব কিছু ম্যানেজ করে ফেলেছে। সম্ভবত তোমার সঙ্গে কথা বলবে একটু পর। মা যাই জিজ্ঞেস করুক, তুমি তোমার মতো উত্তর দেবে। ওকে?'

'ওকে।'

'আমি এখনই মার্কেটে যাচ্ছি। মা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, মানা করেছি আমি। আমার বিয়ের শপিং আমি নিজেই করব। শপিং আর কি, সব তো কেনাই আছে, শুধু আমার একটা শাড়ি, তোমার জন্য একটা পাঞ্জাবি আর টুকটাক কিছু। আচ্ছা বলো তো—।' টিঅ্যান্ডটি ফোনটা বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাজন্যা কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলল, 'আবার টিঅ্যান্ডটি বাজছে। তুমি একটু ধরো তো, কথা শেষ করে আসছি আমি।'

ফোনটা কেটে দিলাম আমি। মাথার ভেতর কোনো কথা ঢুকছে না আমার। বিড়ালটা আবার ফিরে এসেছে। মা'র কপালের ওপর বসে সে একটা একটা করে মাছি ধরে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে থাবা মেরে পিঁপড়ে সরিয়ে দিচ্ছে মা'র মুখের পাশ থেকে।

তলপেটটা ভারী হয়ে এলো আমার। একটু ভারীই ছিল, হঠাৎ করে বেশি হয়ে গেল। দ্রুত বাথরুমে চলে এলাম আমি। চমকে উঠলাম আবার। ছোটখাটো একটা চিৎকারও দিলাম। হাই কমোডের পানিতে একটা বিড়ালের বাচ্চা ডুবে আছে, মা'র কপালের ওপর যে বাচ্চাটা বসে আছে, ঠিক সে রকম একটা বিড়াল বাচ্চা!

আস্তে আস্তে সরে এলাম আমি। মা'র রুমে এসে দেখি, না বিড়ালের বাচ্চাটা নেই। দ্রুত আবার বাথরুমে চলে আসি, না, এখানেও নেই। কমোডের ভেতর শুধু পানিই, একটা কিছুর টুকরোও নেই।

পেটটা খালি করে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম কমোডের সামনে। মিউ করে কোথায় একটা বিড়াল ডেকে উঠল। বাচ্চা বিড়ালের ডাক, আশপাশেই কোথাও আছে সেটা। অনেকক্ষণ খুঁজলাম, পেলাম না।

মা'র রুমে ফিরে আসি আবার। আগের মতোই শুয়ে আছেন তিনি। কিন্তু মা'র চেহারাটা কেমন যেন হাসি হাসি দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক ছিল, এখন বন্ধ। তবে কি মা বেঁচে আছেন এখনো! বিষ খাওয়ার পর সাময়িক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন!

শিরশির করে ওঠে সারা শরীর। মনে হচ্ছে, আমার আশপাশে কেউ একজন আছে। সমস্ত বাড়ি ফাঁকা। কেবল আমি আর মা। একটু আগে বাচ্চা বিড়ালের ডাকের সঙ্গে কারো হেঁটে যাওয়ার শব্দ শুনেছি। মনে হচ্ছিল, মা'র রুম থেকে হেঁটে কেউ বাবার রুমে গেল।

খুট করে হঠাৎ একটা শব্দ হলো। ঝট করে পেছন ফিরে তাকালাম। মা'র আলমারির মাথার ওপর বিড়ালের বাচ্চাটা বসে আছে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল আমার। আলমারির আশপাশে এমন কিছু নেই যাতে ওই ছোট্ট বিড়ালটা অত উঁচুতে উঠতে পারবে!

গলাটা শুকিয়ে গেছে আমার। পানি খাওয়া দরকার। কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। একটু নড়াচড়া করতেও ভয় করছে। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি কেউ একজন আছে, এই বাসার ভেতরেই আছে!

মোবাইলের শব্দে ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভ করতেই রাজন্যা আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আমি এখনই শপিংয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে তোমাকে কিন্তু ডাকব আমি। আসতে পারবে না কিছুক্ষণের জন্য?'

'পারব।'

'তুমি বাসায়ই আছো তো, না?'

'হ্যাঁ।'

'গাড়ি থাকবে আমার সঙ্গে, প্রয়োজন হলে বাসা থেকে নিয়ে যাব তোমাকে। তার আগে অবশ্য ফোন করব তোমাকে। ঠিক আছে?' রাজন্যা সম্পূর্ণ আবেগ ঢেলে দিয়ে বলল, 'আই লাভ ইউ, রাফ।'

ফোনটা কেটে দিল রাজন্যা। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল। না, এবার রাজন্যা না, প্রাচী। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এ মুহূর্তে কথা বলা প্রয়োজন আমার। কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা দরকার। চুপচাপ থাকলেই মাথা আউলা হয়ে যাবে। অবাস্তব কিছু ভেসে উঠবে চোখের সামনে। বলা যায় না, মন খারাপ হলে মা যেমন কফি বানিয়ে আনতেন আমার জন্য, দেখব, একটু পর তেমন কফি বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা আমার সামনে। কিন্তু ব্যাপারটা অসম্ভব। মৃত একজন মানুষ কফি বানাতে পারে না কখনো।

মাথা এই অস্বাভাবিকতা মানবে না, সে তার মতো কল্পনা করবে, চোখও তাই দেখা শুরু করবে।

ফোনটা রিসিভ করলাম আমি। প্রাচী দূরাগত গলায় বলল, 'সম্ভবত আপনার সঙ্গে টেলিফোনে এভাবে আর কখনো কথা হবে না আমার।'

এ ধরনের বাক্য শোনার পর কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে হয়। আমিও কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'কেন?'

হাসতে থাকে প্রাচী, 'হয়তো টেলিফোনে কথা বলার প্রয়োজন হবে না।'

'ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'সব ব্যাপার বুঝতে নেই।' প্রাচী হাসতে হাসতেই বলল, 'আজ রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে, দেখবেন?'

'না।'

'আমিও না। অন্ধকার কোনো দেখার বিষয় না, দেখতে হয় আলো। আচ্ছা, একটা কথা বলি তো আপনাকে। এত দিন জানতাম, আলোর গতি নাকি সবচেয়ে বেশি। এখন নাকি আলোর চেয়ে বেশি গতির কী একটা আবিষ্কার হয়েছে! কয়দিন পর দেখা যাবে আরো বেশি গতির অন্য কিছু আবিষ্কার হয়েছে।' প্রাচী হাসিটা থামিয়ে বলেন, 'আপনি সাধারণত রাত কয়টার দিকে ঘুমান, বলুন তো?'

'ঠিক নেই।'

'যখনই ঘুমান, আজ একটু দেরিতে ঘুমাবেন, প্লিজ। আপনার জন্য একটা সারপ্রাইজ রয়েছে। আচ্ছা—।' প্রাচী কিছুটা সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলেন, 'একজন মানুষের জীবনে প্রতিদিন তো কত ঘটনাই ঘটে। বলতে পারবেন, কোন ঘটনাটা সে দ্রুত ভুলে যেতে চায়?'

'আমি জানি না।'

'পরাজিত হওয়ার ঘটনাটা।'

কলিং বেল বেজে উঠল হঠাৎ। প্রাচী ফোন কেটে দিল। দরজার একটু পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি। ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করছি কে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। কিন্তু বুঝতে পারছি না। একবার বেল টিপে দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পায়চারি কিংবা নড়াচড়া করলে টের পাওয়া যেত ভেতর থেকে। কোনো কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না।

বেলটা আবার বেজে উঠল। আমি নিচু গলায় বললাম, 'কে?'

'আমি।' খুব মিষ্টি স্বরে বলল, 'তিনতলা থেকে এসেছি।'

দরজা খুললাম আমি। তিনতলার মেয়েটা। চেহারাটা হাসি হাসি করলাম, 'কোনো সমস্যা?'

'ঠিক সমস্যা না। সকাল থেকে পানি ছাড়া হয়নি তো। আপনাদের দারোয়ানটাকেও দেখছি না।'

'সরি, এখনই ছেড়ে দিচ্ছি।'

চলে যাচ্ছিল মেয়েটা। দরজার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমি বললাম, 'সম্ভবত আপনার পরীক্ষা চলছে।'

'জি।'

'তাই তো অনেক রাত পর্যন্ত পড়তে শুনি আপনাকে। একটা জিনিস খুব সুন্দর আপনার—ইংরেজি প্রোনানসিয়েশন। ইংরেজি খবর পড়তে পারবেন আপনি। ভালোও করবেন তাতে।'

লজ্জামাখা হাসি দিয়ে চলে গেল মেয়েটি। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আমি। ফোনটা বাজছে। মুশকিল, আজ কেন এত ফোন বাজছে! একটু স্থির হলাম আমি। কই বেশি বাজছে ফোন! একটা মেয়ের আজ বিয়ে, সে একটু বেশি চঞ্চল হবে না আজ! উচ্ছলতা একটু বেশি দেখাবে না সে!

মা'র ঘরের ওয়ারড্রবের ওপর রাখা ফোনটি হাতে নিলাম। অপরিচিত নাম্বার। রিসিভ কলাম তবুও, 'রাফিদ?'

গলার স্বরও অপরিচিত। ইতস্তত স্বরে বললাম, 'জি।'

'আমি রাজন্যার মা।'

সালাম দিলাম আমি আন্টিকে। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'একটু বেশি রাতেই তোমাদের বিয়েটা কমপ্লিট করতে চাচ্ছি আমি। তোমার কোনো সমস্যা আছে, রাফিদ?'

'না, আন্টি।'

'প্রোগ্রাম তো তেমন কিছু না। তবু সেটা আমার বাসাতেই করতে পারতাম। কিন্তু তুমি তো জানো, রাজন্যার বাবার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। পরে সে যখন ব্যাপারটা জানতে পারবে, তখন ভুল বুঝতে পারে রাজন্যাকে। তোমাদের বাসাতেও তো করা সম্ভব না।'

'জি।'

'আমি চাই না খুব বেশি মানুষ ব্যাপারটা জানুক।'

'জি।'

'বিয়ের কাজটা এত তাড়াতাড়ি না করলেও হতো। কিন্তু—।' একটু থেমে আন্টি বলেন, 'অবশ্য ইস্যুটা তোমরা এক্সসেপ্ট নাও করতে পারতে। অনেকেই তো এমন ভুল করে!'

'সরি আন্টি। ওটা কোনো ভুল না। আমারও না, রাজন্যারও না। আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি। ওটা ভালোবাসার একটা উপসর্গ।'

'আই অলসো বিলিভ দ্যাট। রাফিদ—।' আন্টি কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'তুমি কি জানো এজন্যই আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। অনেকেই তোমাকে পছন্দ করে। তুমি বেশ অন্য রকম, রাফিদ। আচ্ছা, তোমার বাবার কথা না হয় বাদ দিলাম, তোমার মাকে আনতে পারবে তো বিয়েতে?'

'মা'র শরীরটা ভালো নেই, আন্টি।' কষ্ট হলো মিথ্যাটা বলতে।

'তাহলে থাক।'

'আপনি তো আছেন, আপনিও তো মা।'

চুপ হয়ে রইলেন আন্টি। অনেক আবেগী মানুষ দেখেছি আমি, আন্টির মতো খুব কম দেখেছি। একবার আমি, রাজন্যা আর আন্টি নাটক দেখতে গিয়েছিলাম বেইলি রোডে। গাড়ি থেকে নেমেছি আমরা। টিকিট কাটতে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা মহিলা এসে হাত পেতে দাঁড়ায় আন্টির সামনে। মহিলার গায়ের শাড়িটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে প্রায়। চেহারা ম্লান করে ফেলেন তিনি। কী যেন কথা বলেন মহিলাটির সঙ্গে। বেইলি রোডে অনেক শাড়ির দোকান, হাত ধরে একটা দোকানে নিয়ে যান আন্টি তাকে। বেছে বেছে চারটা শাড়ি কেনেন আন্টি। মহিলাকে দিয়ে বাসায় চলে আসেন। নাটক আর দেখা হয় না সেদিন আমাদের।

সেই আন্টির সংসারটা টিকল না, রাজন্যার বাবাকে ছেড়ে অন্য একজনের সঙ্গে সংসার করছেন তিনি এখন। ঘটনা একটা আছে, রাজন্যা অনেক দিন বলতে চেয়েছে আমাকে, কিন্তু শুনতে ইচ্ছে করেনি আমার।

চার ঘণ্টা হয়ে গেছে, মা শুয়ে আছেন চুপচাপ, পাশে বসে আছি আমি। এই প্রথম আমার ভয় ভয় করতে লাগল। একটা মৃত মানুষের পাশে, একা এক বাড়িতে, শব্দহীন অপেক্ষা করছি আমি। কিসের অপেক্ষা করছি আমি! সমস্ত শরীর হঠাৎ টানটান হয়ে গেল আমার—হ্যাঁ, একটা কিছুর জন্য তো অবশ্যই

আমি অপেক্ষা করছি।

মা'র দিকে ভালো করে তাকালাম। হঠাৎ, হঠাৎ খেয়াল করি মা'র শরীরটা ফুলে উঠেছে, বেশ ফুলে উঠেছে। কেমন যেন বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। দ্রুত আমি ঘরের এসিটা ছেড়ে দেই। মার মুখের দু'পাশটা চেপে ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। আমার মা, কী অদ্ভুতভাবে স্থির হয়ে আছেন!

মোবাইলটা বাজছে অনেকক্ষণ ধরে। ধরতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বেজেই চলছে সেটা। না ধরা পর্যন্ত বাজতেই থাকবে। অগত্যা রিসিভ করলাম। রাজন্যা খুব কাতর গলায় বলল, 'ঘুমাচ্ছিলে তুমি?'

'না।'

'বাসাতেই তো আছ?'

'হ্যাঁ।'

'একটু বের হবে?'

'তুমি এখনো শপিং করছ!'

'জিনিসপত্র কেনা যে কী ঝামেলা সেটা তো তুমি জানো না। সব কেনা হয়ে গেছে, শুধু একটা জিনিস কেনা বাকি। জিনিসটা আমি তোমার পছন্দে কিনতে চাই, রাফ। প্লিজ আসো না একটু।'

সন্ধ্যার ঠিক একটু আগে রাজন্যা হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার তিনটে ঘণ্টা নষ্ট করলাম আমি। কী করব বলো, তুমি নিজেই তো দেখলে, যা চাই তা পাওয়া যায় না। চলো, এবার তোমাকে স্পেশাল একটা কফি খাওয়াব।'

মাথার ভেতর সারাক্ষণ মা বসে আছেন, একটু সময়ের জন্যও বের করতে পারিনি তাকে। কফির কথা শুনে মা আরো বেশি জায়গা নিয়ে ফেললেন মাথায়। অস্থির লাগছে আমার এখন। মা এখন বাসায় একা! কেমন আছে মা? বিড়ালের বাচ্চাটি কি আবার এসেছে?

মোবাইল বাজছে পকেটে। কারো সঙ্গে কথা বলা দরকার। চিন্তা অন্যদিকে নেওয়া প্রয়োজন। দ্রুত সেটা রিসিভ করতেই খা খা করে হাসতে হাসতে সেকেন্ড অফিসার মুশফিক সাহেব বললেন, 'আরে ভাই, সেই সকালে বললেন বান্ধবীর সঙ্গে আছেন আপনি, এখনো তো দেখি সেই বান্ধবীর সঙ্গেই আছেন। সারাদিন বান্ধবীর সঙ্গে, পারেনও ভাই আপনারা!'

'কোথায় দেখলেন আপনি আমাকে!'

'এই তো একটু আগে দেখলাম, রাস্তা পার হচ্ছেন আপনারা। মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার হাতে অনেক শপিংয়ের ব্যাগ, আপনার বান্ধবীর হাতেও। ভাবলাম, একবার থামিয়ে কথা বলি। আবার মনে করলাম, কাবাবের হাড্ডি হওয়ার কী দরকার!' খা খা করে এখনো হাসছেন মুশফিক সাহেব, 'সারাদিন আমিও খুব ব্যস্ত ছিলাম। দুই ঘণ্টা পর ফোন দেওয়ার কথা বলেও তাই ফোন দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আর ফোন দেব না। মিষ্টি নিয়ে রাতে একেবারে বাসায় চলে যাব আপনার। তা ভাই, রাতে আর মানা করবেন না, আমি আসছি কিন্তু। ধাঁধার উত্তরটা না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

কথা শেষ করে ফোনটা পকেটে রাখতে নিয়েই দেখি, মুগদাপাড়া হাই স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক মাহতাব উদ্দিন সাহেব তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। ইতস্তত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমার পাশে রাজন্যাকে দেখে দ্বিধা করছেন কাছে আসতে। আমিই এগিয়ে গেলাম। খপ করে তিনি আমার একটা হাত চেপে ধরে, হাতের মুঠোর ভেতর কাগজের মতো কিছু একটা গুঁজে দিয়ে বলেন, 'মাফ করবেন আমাকে। টাকাটা দেওয়া তো দূরের কথা, এত দিন ফোন করার পর্যন্ত সময় পাইনি আপনাকে। আজ টাকাটা দিতে পেরে বুকের ওপর থেকে একটা চাপ কমে গেল আমার।'

'আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'বড়ই পেরেশানের মধ্যে আছি। ছেলেটা খুব আওয়ারা হয়ে গেছে। নেশা এত বেশি শুরু করেছে সে, শেষ পর্যন্ত মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি না করে পারলাম না। এই তো কিছুক্ষণ আগে ভর্তি করিয়ে এলাম। পাশের রাস্তার পাশেই কেন্দ্রটা।'

'টাকাটা এখন দেওয়ার দরকার নেই। আপনার এখন প্রয়োজন, পরে দিলেই চলবে।' টাকাটা বাড়িয়ে দিই আমি ওনার দিকে। তিনি টাকাটা না নিয়ে, আমার হাতটা চেপে ধরে বলেন, 'আল্লাহপাকের কাছে সারাদিন চোখের পানি ফেলি আর দোয়া করি—হে আল্লাহ, তুমি আমার ছেলেকে হেদায়েত করো, করুণা করো। তাকে তুমি রক্ষা করো খোদা। আল্লাহপাক নিশ্চয়ই আমার দোয়া কবুল করবেন।' মাহতাব উদ্দিন স্যারের চোখে পানি। তিনি আমার হাতটা আরো একটু চেপে ধরে বলেন, 'আপনিও

একটু দোয়া করবেন। আপনি ভালো মানুষ, আল্লাহপাক আপনার দোয়া কবুল করবেন।'

ন'টা বেজে গেল বাসায় ফিরতে ফিরতে। রাজন্যা রেডি হয়ে ফোন করবে, তারপর আমি রেডি হব। বাসা থেকে নিয়ে যাবে ও আমাকে।

বাসায় ঢুকেই লাইট জ্বালালাম ড্রইংরুমের। একটু এগিয়ে গিয়ে মা'র ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ভয় করা শুরু করল হঠাৎ আমার। মনে হচ্ছে, দরজা খুলেই দেখব মা বসে আছেন বিছানায়, কফি খাচ্ছেন আরাম করে।

মা'র ঘরের ভেতর অন্ধকার। দরজা খুলতে সত্যি সত্যি ভয় করছে। দরজার নবে হাত দিতে গিয়ে টের পেলাম, হাত কাঁপছে আমার। শরীরও কাঁপছে একটু একটু।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চারদিকে নিশ্চুপ। হঠাৎ পানির শব্দ। পাশের বাথরুমে গিয়ে উঁকি দিলাম, না, কোনো পানি পড়ছে না। পেছনের বাথরুমে গেলাম, সেখানেও না। জানালার পাশে দাঁড়াতেই টের পেলাম, নিচে পানি পড়ছে, ছাদ থেকে পড়ছে। সকালে সেই যে পানি ছেড়েছি, বন্ধ না করেই বাইরে গিয়েছিলাম। ট্যাংকি পুরো হয়ে ছাদে পড়ছে পানি, সেখান থেকে নিচে।

মোবাইল বেজে উঠল। সেকেন্ড অফিসার মুশফিক সাহেব ফোন করেছেন। রিসিভ করলাম না আমি। ফোনটা বেজেই যাচ্ছে। ড্রইংরুমের লাইটটা অফ করে দিলাম আমি দ্রুত। তিনি যদি বাসায় এসে পড়েন হঠাৎ, তাহলে আমাদের ফ্ল্যাটটা অন্ধকার দেখে যেন বুঝতে পারেন, বাসায় কেউ নেই।

ফোনটা থেমে গিয়ে আবার বেজে উঠল। না, মুশফিক সাহেব না, বড় আপা। অনেক দিন পর আপা ফোন করেছেন। দ্রুত রিসিভ করলাম আমি ফোনটা। আপা খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'মা কেমন আছে রে, রাফিদ?'

'ভালো আছে। তুমি তো অনেক দিন পর, আপা!'

'ভয়াবহ একটা ঝামেলায় ছিলাম রে। মাকে একটু দে তো।'

'মা তো তোমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

'তুই একটু রিকোয়েস্ট কর না মাকে। মা তোর কথা শুনবে।'

'লাভ হবে না।'

'আচ্ছা বল তো, আমি কি খুব বেশি দোষ করেছি! অনেক মেয়েই তো বয়স্ক মানুষকে বিয়ে করে। বিয়ে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার, ভালো লাগালাগির ব্যাপার, যার যার পছন্দের ব্যাপার। সেখানে অন্য কারো অসুবিধা থাকার কথা না।' কিছুটা ভেজা ভেজা স্বরে আপা বলেন, 'মাকে বলিস, এক সপ্তাহ পর আমি বাংলাদেশে আসছি। পা ধরে বসে থাকব তার, দেখি, কীভাবে মুখ ফিরিয়ে রাখে!'

ফোনটা কেটে দিল আপা। সঙ্গে সঙ্গে আবার করে বলল, 'ভালো কথা, তুই কেমন আছিস, সেটা তো জানা হলো না।'

'এ মুহূর্তে খুব ভালো আছি আপা। আমি এখন একটা মৃত মানুষের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছি। একা। অন্ধকার। কিন্তু পাশে কেউ নেই।'

'এসব কী বলছিস তুই!'

'অন্য রকম একটা থ্রিল অনুভব করছি, আপা।'

'মৃত মানুষটা কে?'

'তুমি তাকে চেনো।'

'আমি চিনি!'

'হ্যাঁ।'

সমস্ত উত্তেজনা নিয়ে আপা বলল, 'প্লিজ, বল না, কে?'

ফোনটা কেটে দিলাম আমি, ছুড়ে ফেললাম সামনের সোফায়। থাক, আপা একটা টেনশনে থাক। মা'র জন্য কেবল আমিই টেনশনে থাকব! আপাও তো মা'র সন্তান। ফোন বেজে যাচ্ছে, মুশফিক সাহেব কিংবা আপা করেছে, ফিরেও তাকাচ্ছি না আমি সে দিকে।

সব কিছু কেমন যেন একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেল হঠাৎ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একেবারে চুপচাপ। ঝনঝন করে টিঅ্যান্ডটি ফোনটা বেজে উঠল। থেমে গেল, আবার বেজে উঠল। আবার থেমে গেল, আবার বেজে উঠল। বিরক্ত লাগছে। চতুর্থবারের সময় রিসিভ করলাম ফোনটা। লম্বা করে একটা সালাম দিলেন একজন। তারপর বললেন, 'ময়মনসিংহ থানা থেকে সাব-ইন্সপেক্টর সানাউল্লা বলছি। এটা কি আসিফুজ্জামান খান সাহেবের বাসা?'

'জি।'

'উনি আছেন?'

'নেই।'

'ওনার মোবাইল নম্বরও বন্ধ। আচ্ছা, আপনি কে বলছেন?'

'আমি ওনার ছোট ছেলে।'

'রাবিদ তাহলে বড় ছেলে।'

'জি।'

'খবরটা আপনাকে জানালেও চলবে।' সাব-ইন্সপেক্টর সানাউল্লাহ সাহেব গলার স্বরটা সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে বললেন, 'একটা মার্ডার কেসে ধরা পড়ে রাবিদ এখন ময়মনসিংহ জেলে আছে। কাল দুপুরের আগে আপনার বাবাকে থানায় এসে দেখা করতে বলবেন। সমস্যাটা কিন্তু গুরুতর।'

'ভাইয়া মার্ডার করেছে!'

'সেটা কোর্ট বলবে। কিন্তু তার আগে আপনার বাবার আসা দরকার। ওকে, আজ রাখি। স্লামালাইকুম।'

ভাইয়ার মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সারা মাথায় কোঁকড়ানো চুল। চোখে-মুখে দুষ্টুমি। গম্ভীর হওয়া কী জিনিস, জানেই না সে। সারাক্ষণ হাসি হাসি করে রাখে চেহারাটা, যেন টেনশন, দুশ্চিন্তা বলে কোনো শব্দ নেই। তুখোড় একটা ছাত্র। কিন্তু এই মানুষটাই খুন করেছে!

কলিং বেল বেজে ওঠে। চমকে উঠি আমি। শব্দ না করে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকাই, কেউ নেই। আবার বেজে ওঠে বেলটা, সঙ্গে শব্দও হয় দরজাতে। এবার আরো বেশি চমকে উঠি আমি। দরজার কাছে এসে গেছে মানুষটা!

ভয় ভয় পায়ে এগিয়ে গেলাম আমি দরজার দিকে। ব্যাপারটা টের পেলেন ওপাশের মানুষটা। কিছুটা হেসে বললেন, 'আমি সেকেন্ড অফিসার মুশফিকুর রহমান। দরজাটা খুলুন।'

বুকের ভেতরটা চেপে আসল হঠাৎ। দেরি করা যাবে না একটুও। দ্রুত মা'র ঘরের সামনে গেলাম, দরজা বন্ধই আছে। আমি ফিরে এলাম আগের জায়গায়। লাইটটা জ্বালিয়ে দরজা খুলতেই মুশফিক সাহেব খা খা করে হেসে উঠে বললেন, 'আরে ভাই, ঘুমাচ্ছিলেন নাকি! ঘরের লাইটও বন্ধ ছিল, মোবাইলও বন্ধ। বেশি দেরি করব না। নিজ হাতে মিষ্টিটা খাইয়েই চলে যাব।' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, 'বাসা তো একেবারে কবরস্থানের মতো নীরব, আর কেউ নাই নাকি!'

'বসুন না।'

'না ভাই, বসতে আসিনি। রাত করে এসেছি, আপনাকে বিরক্ত করা

ঠিক হবে না। আচ্ছা—।' সোফায় বসতে বসতে মুশফিক সাহেব বললেন, 'কেমন যেন গুমোট ভাব ঘরের ভেতর। এত বড় বাসা, আপনি একা! ওই রুমগুলোতে থাকে কে?'

'মা থাকেন, বাবা থাকেন।'

'ওনারা কোথায়?'

'বাইরে গেছেন।'

'নিশ্চয় ডিনার করতে। বড়লোকরা তো আজকাল রাতের খাবার বাইরেই খায় প্রতিদিন।' মিষ্টির প্যাকেট থেকে একটা মিষ্টি বের করে মুশফিক সাহেব বললেন, 'নিন ভাই, মিষ্টিটা মুখে দিন। আমি তো একটা কাজ করেছি, ওই ধাঁধাটা আমার এক বান্ধবীকে বলেছি। তারপর শর্ত দিয়েছি, ওটার উত্তর বের করতে পারলে এক বেলা চায়নিজ। সে তো মহাব্যস্ততার মধ্যে আছে। আচ্ছা—।' মুশফিক সাহেব ড্রইংরুমের চারপাশ তাকিয়ে বললেন, 'একটা ফ্ল্যাট কিনতে চাচ্ছি, অবশ্য নিজের টাকায় না, গ্রামে কিছু জমি আছে, সেগুলো বেচে কিনব। কিন্তু রুমগুলো কেমন যেন ছোট। আপনাদের রুমগুলো তো বেশ বড় বড়। দু-একটা রুম দেখি তো আপনাদের।'

উঠে দাঁড়ালেন মুশফিক সাহেব। মা'র রুমের দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই থেমে গেলেন। মোবাইল বেজে উঠেছে তার। রিসিভ করেই চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'সরি স্যার, আমি এখনই আসছি।' ফোনটা রেখেই চেহারাটা বিকৃতি করে বললেন, 'কী যে একটা চাকরি করি না, ভাই। রাত নাই, বিরাত নাই, চব্বিশ ঘণ্টা তটস্থ থাকতে হয়। শান্তি নাই। আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা ছিল আমার। আর একদিন আসতে হবে। আজ যাই।'

কিছুটা ঝড়ের বেগে চলে গেলেন মুশফিক সাহেব। আমি আবার একা হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে মোবাইলটা বন্ধ। সুইচ অন করলাম সেটার। মিসড কল অ্যালার্ট–এ রাজন্যার নাম্বার। একবার, দুবার না, নয়বার ফোন করেছে ও। কল ব্যাক করলাম আমি ওকে। রিসিভ করেই ও খুব নরম গলায় বলল, 'তুমি ভালো আছ তো, রাফ?' অন্য কেউ হলে নয়বার কল করে, ফোন বন্ধ পেয়ে, রেগে টং হয়ে থাকত। কিন্তু ও স্বাভাবিক। ওর এই স্বাভাবিকতাই আমাকে অপরাধী করে তোলে বারবার। ও যেদিন বলল, রাফ, আই অ্যাম ক্যারিইং, পাগল হওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আমার। কিন্তু ও ছিল স্বাভাবিক, খুব শান্ত, স্থির। একটা অবিবাহিত মেয়ে, পেটে বাচ্চা এসেছে তার, কোনো উদ্বিগ্নতা নেই ওর মাঝে। যেন জীবন এ

রকমই, এভাবেই ঘটে আসছে সবকিছু।

'আমি এখন গাড়িতে, আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। তুমি রেডি হয়েছ?'

'এই তো হয়ে যাব।'

'রেডি হয়ে আর দেরি করো না। অনেকেই থাকবে, তুমি না আসা পর্যন্ত খুব একা একা লাগবে আমার।' রাজন্যা একটু থেমে বলে, 'কোনো কারণে তোমার মন খারাপ না তো, রাফ?'

'না, একদম না।'

'বিয়ের সিদ্ধান্তটা আমি নিজে নিয়েছি, তুমি কী অবলীলায় সম্মতি জানালে! তুমি এত ভালো কেন, রাফ?'

'তুমি ভালো বলে।'

'চার বছরের সম্পর্ক আমাদের, সম্ভবত কোনোদিন কখনো মন খারাপ করিয়ে দেইনি আমি তোমার। মনে হচ্ছে, বাকি জীবনেও দেব না। তোমার বুকের যে জায়গাটায় তুমি আমাকে রেখেছ, শুধু সেই জায়গাটায় তুমি আমাকে সারাজীবন রেখো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং মোর।'

দেয়াল ঘড়িতে শব্দ হলো—রাত সাড়ে এগারোটা। রাজন্যা এর মধ্যে আরো চারবার ফোন দিয়েছে। একবারও রিসিভ করিনি আমি। মোবাইলে গেমস খেলেছি আমি—স্নেক জেনিয়া। একটা সাপ একটা করে ফোঁটা গিলে ফেলে, একটা করে নম্বর পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ পর পর বড় লাল একটা ফোঁটা আসে, সেটা গিলে ফেলতে পারলে একসঙ্গে অনেক বেশি নম্বর। হঠাৎ ভুল হলেই সাপটা নিজেই নিজেকে কামড় দেয়, খেলা শেষ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত এগারোবার খেলেছি। সর্বোচ্চ স্কোর করেছি ছয়শ তের।

খেলতে খেলতে কখনো কখনো বোর হয়ে গেছি। তখন এমনি এমনি নাম্বার টিপতাম, ওপাশ থেকে রিসিভ হলেই এমনি নাম বলতাম—ফিরোজ সাহেব আছেন, মিজান মল্লিক আছেন? স্বভাবতই সবাই বলতেন, রং নাম্বার। আমি বলতাম, সরি। আসলে আমি করছিলাম অপেক্ষা, এখনো করছি। এ ছাড়া এ মুহূর্তে আমার আর কিছু করার নেই।

সারা ঘর অন্ধকার। মেঝেতে বসে আছি আমি, চুপচাপ। এরই মধ্যে একটা বিড়াল বাচ্চাকে যেতে দেখলাম মা'র ঘরে। একটু পর মা বের হয়ে কিচেনে গেলেন, কাচের একটা গ্লাসে দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন আবার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল আমার কাছে—কে যেন এক কাপ কফি বানিয়ে রেখে গেছে আমার সামনে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বুজে ছিলাম

আমি। কফির গন্ধে চোখ খুলেই দেখি, কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে, এই মাত্র কে যেন রেখে গেছেন। বিড়াল-বাচ্চার জন্য দুধ নিয়ে যাওয়া দেখে মনে হলো, কফিটা মা নিজেই দিয়ে গেছেন। চোখ বোজা দেখে ভেবেছিলেন ঘুমাচ্ছি। তাই আর জাগাননি।

কিসের যেন একটা শব্দ হলো। চমকে উঠলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, মা তো মারা গেছেন! মা কীভাবে কফি দেবেন আমাকে! তিনি কীভাবে হেঁটে কিচেনে যাবেন! আমি কি তাহলে ভুল দেখলাম!

মা'র ঘরের দরজাটা এখনো বন্ধ। বাইরে থেকে সেই নয়টায় বাসায় ফিরেছি, এখনো ঘরে ঢুকিনি তার। মা কি এখনো হাঁ করে আছে? মাছি কি আরো বেড়ে গেছে? পিঁপড়া? বিড়াল বাচ্চাটা?

মাথার ভেতর চিনচিন ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আবার। একটা ধাঁধা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কাকে বলব? মুশফিক সাহেবকে কি আরেকটা ধাঁধা বলে মাথা আউলা করে দেব! সবচেয়ে ভালো হবে, যদি আমাদের এলাকার এমপিকে ফোন করা যায়। ফোন করেই খুব স্বাভাবিক গলায় বলতে হবে—ভাই, কাবিখা'র খবর কী?

আমাদের দেশের অধিকাংশ এমপি খুবই অশিক্ষিত। তিনি তখন অবাক হয়ে বলবেন, কাবিখা কী?

কাবিখা কি জানেন না! আপনি যে কোটিপতি হয়েছেন সেটা তো ওই কাবিখার বদৌলতেই। তবে সাবধান, আপনার পেট ফুলে যা হয়েছে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আর কিছু আপনার পেটে গেলে কিন্তু পেটটা ব্রাস্ট হতে বাকি থাকবে না। আচ্ছা, আপনি মরে গেলে আপনাকে কবর দেওয়া হবে, না বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে চার রাস্তার মোড়ে টাঙ্গিয়ে রাখা হবে? এটুকু বলেই ফোনটা বন্ধ করে দিতে হবে। সারারাত ঘুম হারাম হয়ে যাবে ওর।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। পাশেই রয়েছে সেটা। স্ক্রিনে রাজন্যার নাম। ফোনটা বাজছেই এবং থেমে গেল একটু পর।

খুট করে শব্দ হলো কোথাও। কান পেতে রইলাম আমি। খস খস করে কে যেন হাঁটছে। অন্ধকারে চোখ মেলে দিলাম, না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরো ভালো করে চোখ মেললাম। সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটা বেজে উঠল। ধক করে উঠল কলজেটা।

ধীর পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম আমি। আমি জানি কে

এসেছেন। দরজাটা খুলে দিলাম। বাবা ঢুকলেন ঘরে, সঙ্গে একটা মেয়ে। বিয়ের শাড়ির মতো একটা শাড়ি পরে আছে মেয়েটা। আমাকে দেখে দুষ্টুমির একটা হাসি দিলেন তিনি।

বাবা তার ঘরে ঢুকে গেলেন, মেয়েটাও। একটু পর মাতাল স্বরে বাবা আমাকে ডাকলেন। খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'গত রাতেই তো তোমাকে সব বলেছি, এ হচ্ছে—।' বাবা হঠাৎ থেমে গিয়ে কী যেন মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর নিজের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, 'সিগারেট আনতে ভুলে গেছি। তোমার কাছে সিগারেট আছে?'

'বাবা, আপনি তো জানেন, আমি সিগারেট খাই না।'

'অ, ইয়েস। কিন্তু সিগারেট না হলে তো আমার চলবে না। তোমরা কথা বলো, আমি বরং এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনি। এই যাব আর আসব।'

কিছুটা টলতে টলতে বাবা চলে গেলেন। মেয়েটার দিকে তাকালাম আমি। মেয়েটা হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার বাবা গত রাতে আপনাকে সব বলেছেন, সম্ভবত কোনো কিছু বুঝতে বাকি নেই আপনার।'

কিছু বললাম না আমি। বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর বললাম, 'আপনার বয়স তো বেশি না, অ্যাবাউট সিক্সটি ইয়ারস ওল্ডের একজন মানুষকে বিয়ে করতে খারাপ লাগল না আপনার?'

'না। জীবনটা এত খারাপ লাগার ভেতর দিয়ে গেছে যে অনেক খারাপই এখন আর খারাপ বোধ হয় না।'

'বিয়ে করে আপনার ভালো লাগছে?'

'সেটাও বুঝতে পারছি না। মানুষের বোধ মরে গেলে যা হয় আর কি!'

মেয়েটার দিকে আরো ভালো করে তাকালাম, 'প্রায়ই আপনি আমাকে ফোন করতেন, না?'

'চিনতে পেরেছেন আপনি আমাকে!'

'হ্যাঁ, আপনি প্রাচী।'

হাসতে নিয়েই আতঙ্কে চমকে উঠলেন মেয়েটা। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পকেট থেকে বের করা কাটারটা দিয়ে লম্বা একটা পোচ দিলাম প্রাচীর গলায়। সরলরেখার মতো একটা রক্তের দাগ গলার নিচে ভেসে উঠল তার।

বাবার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম আমি। মা'র ঘরের দরজাটা খোলা।

বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'তোমার মা এভাবে শুয়ে আছে কেন?'

'মাকে খুন করা হয়েছে।'

'কী!'

'জি। তিনটি কারণে খুন করা হয়েছে। এক. মা খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন বাবা, এই কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যদিও কষ্টটা পাচ্ছিলেন আপনার জন্য, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে আপনাকে মেরে ফেললেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যেত। স্বামীর মৃত্যুতে যেমন কোনো গুণবতী স্ত্রী সুখী হন না, মা-ও তেমনি আপনার মৃত্যুতে সুখী হতেন না, কষ্ট পেতেন আরো। যত দিন বেঁচে থাকতেন, তত দিন পেতেন। তাই মাকেই—। দুই. মা প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাচ্ছিলেন। প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাওয়ার চেয়ে একেবারেই মরে যাওয়া ভালো। তাই—। তিন. আপনার নতুন জীবন, আপনার নতুন সংসার।'

দরজাটা বন্ধ করে দিই আমি। এগিয়ে যাই বাবার দিকে, 'মা এত কষ্টে ছিলেন, তবু একটা আশা ছিল তার, ক্ষীণ আশা—আপনি ফিরে আসবেন, সবকিছু ছেড়ে আপনি তাকে আগের মতো ভালোবাসবেন। মানুষের যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ তার বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকে। আজ রাতের পর তার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছেও হতো না। তাই আমি নিজেই—।'

বাবার দিকে আরো একটু এগিয়ে যাই। চোখ দুটো বড় করে ফেলেছেন তিনি। ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছে, মনে হচ্ছে কোনো কথা বলবেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। আমি একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, 'বাবা, এবার আপনি বলুন তো—আপনার কি এখন বেঁচে থাকা উচিত!'

কোনো জবাব দেন না বাবা। পিছিয়ে যান একটু, কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেন না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পকেট থেকে কাটারটা বের করে রক্তের লম্বা একটা সরলরেখা টেনে দেই তার গলার নিচে।

গলা শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে আমার। পানির পাম্পটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছাদে জমে থাকা পানিগুলো নিচে পড়ছে এখনো। ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে তার। একটানা।

মা'র ঘরের জানালাটা বন্ধ। এসি চলছিল, সুইচ অফ করে দিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। আমাদের পাশের প্লটটা খালি, সেখানে জঙ্গলের

মতো হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের ওপর অনেকগুলো জোনাকি পোকা উড়ছে। মুগ্ধ হয়ে আমি জোনাকি দেখছি। কংক্রিটের এই শহরে জীবন্ত উড়ন্ত আলো!

পকেটের মোবাইলটা বাজছেই। আমি নিশ্চিত রাজন্যার ফোন। ঘুরে মা'র দিকে তাকালাম আমি। না, মা'র মুখে কোনো মাছি নেই, পিঁপড়াও নেই। আশপাশে খুঁজলাম, বিড়াল বাচ্চাটাও নেই।

হঠাৎ চমকে উঠি আমি। রাজন্যা দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি পছন্দ করতে পারছিল না ও, শেষে আমি পছন্দ করে দিয়েছি। ওই শাড়িটা পরে দাঁড়িয়ে ও দরজার সামনে। চেহারাটা কেমন যেন ম্লান ওর, চোখ দুটোও ভেজা ভেজা।

মা'র পায়ের কাছে বসে পড়লাম আমি। কাপড়টা একটু উপরে উঠে গেছে, টেনে ঠিক করে দিলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। পানির পিপাসাটা আরো প্রচণ্ড হয়েছে। ঝট করে চোখ যায় মা'র গ্লাসটার দিকে। সকালে যে পানি খেতে দিয়েছিলাম, সবটুকু খেতে পারেননি মা, বেশ কিছু রয়ে গেছে।

গ্লাসটা হাতে নিলাম আমি। চোখের সামনে মেলে ধরলাম। পানিটা পানির রঙে নেই, সাদাটে। টের পেলাম, হাতটা কাঁপছে। বুকটা ধকধক করছে। নিঃশ্বাস ঘনঘন হচ্ছে। সব জড়তা কাটিয়ে গ্লাসের বাকি পানিটুকু খেয়ে ফেললাম আমি এক নিঃশ্বাসেই।

কিছুক্ষণ।

গলাটা আস্তে আস্তে পুড়ছে আমার। একটু একটু ভয়ও করছে। ভয়টা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ছোটকালে কোনো কিছুতে ভয় পেলে দৌড়ে মা'র কাছে যেতাম। দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরতেন মা আমাকে। মার পেটের ওপর মাথা রাখলাম আমি। না, মা আজ জাপটে ধরছেন না। ভয়ে আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি। কিন্তু মা'র হাত আর এগিয়ে আসে না, জাপটে ধরে না আমাকে।

মায়ের পেটে মাথা রেখেই দরজার দিকে তাকাই। না, রাজন্যা আর নেই। সম্ভবত মেয়েটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে বিয়ের আসরে, অপূর্ব সাজে তাকিয়ে আছে, একটু পর পর সবার অলক্ষে পেটে হাত বুলাচ্ছে, নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিজেই নিজেকে বলছে, কুল বেবি, প্লিজ ওয়েট। ইউর ফাদার ইজ কামিং। কামিং সুন।

চোখ দুটো ভিজে ওঠে আমার। কী আশ্চর্য, উঠে বসেছেন মা। আঁচল

দিয়ে আমার চোখ মুছে মাথাটা ঠেসে ধরেছেন বুকের সঙ্গে। মাথায় হাত বুলাচ্ছেন তিনি। শরীরটা আবেশে ছেড়ে দেয়, আরামে চোখ দুটো বুজে আসে আমার।

কয়েক হাত দূরে, মেঝেতে চার হাত-পা গুটিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বিড়াল বাচ্চাটি!

Pathfinder